আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫

শহীদ দিবস
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
২০১৫

MARTYRS' DAY

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY 2015

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৪তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
বাংলা ভাষায় ভাষণ দান করছেন।
২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯

ফে ব্রু য়া রি

২১

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫

স্মরণিকা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

আবুল বরকত : শহীদ আবুল বরকতের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার ভরতপুর থানা বাবলা গ্রামে। ১৯২৭ সালের ১৬ জুন তাঁর জন্মদিন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করে পূর্ববাংলায় চলে আসেন ১৯৪৮ সালে। ওই বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫১ সালের বিএ অনার্স পরীক্ষায় ২য় শ্রেণিতে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছিলেন। শহীদ বরকত ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে এসেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেই তিনি পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হন। অত্যধিক রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়। বহু কষ্ট করে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে, পরে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা হয়।

রফিকউদ্দিন আহমদ : শহীদ রফিকের জন্ম ১৯২৬ সালের ৩০ অকটোবর, মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর থানার পারিল গ্রামে। তাঁর বাবার নাম আবদুল লতিফ, মা রাফিজা খাতুন। শহীদ রফিক বাবার প্রথম সন্তান। তাঁর পিতার প্রেস ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে অধ্যয়ন করতেন। শহীদ রফিকের বিবাহের দিন ধার্য হয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই। কন্যার নাম পানুবিবি। ২১ ফেব্রুয়ারিতে প্রথমে শোনা যায় তিনজন ছাত্র মারা গেছে। শহীদ রফিকের ভগ্নিপতি মোবারক আলী খানের মাধ্যমে জানা যায় শহীদ রফিকের মাথায় গুলি লেগেছে। গুলির আঘাতে শহীদ রফিকের মগজ বেরিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়ে বলেও শোনা যায়।

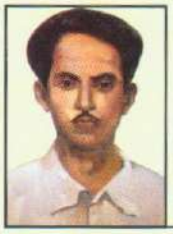

শফিউর রহমান : ১৯১৮ সালের ২৪ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলায় কোন্নগর গ্রামে শহীদ শফিউর রহমানের জন্ম। ১৯৪৫ সালের ২৮ মে কলকাতার তমিজউদ্দিন আহমদের কন্যা আকিলা খাতুনের সঙ্গে তাঁর বিবাহ। দেশবিভাগের পর পিতা মাহবুবুর রহমান ঢাকা চলে আসেন। পড়াশোনার পাশাপাশি শহীদ শফিউর রহমান ঢাকা হাইকোর্টে কেরানি পদে চাকরি করতেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান সাইকেলে অফিসে যাওয়ার পথে নবাবপুর রোডে ভাষার দাবিতে আন্দোলনরত মিছিলে পুলিশ গুলি করলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলেও শেষপর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি। অতিকষ্টে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল বলে আজিমপুর গোরস্তানে দাফন করা সম্ভব হয়।

তাঁদেরই আত্মত্যাগে

ভাষা-আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছিলেন তার সঠিক সংখ্যা অজানাই রয়ে যাবে। শুধু ছাত্র নন, ওই মহান আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সাধারণ মানুষও। মরদেহ ও পরিচয় পাওয়া গেছে মাত্র সাতজনের, অবশিষ্ট শহীদেরা বিস্মৃতির পাতায়, কারণ মুসলিম লীগ সরকারের পুলিশ অধিকাংশ লাশ সরিয়ে ফেলে, গায়েব করে দেয়।

আবদুল জব্বার : শহীদ আবদুল জব্বারের জীবন প্রকৃত অর্থেই বৈচিত্র্যময়। আর্থিক কারণে পঞ্চম শ্রেণির বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি, তবে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তাঁর স্বভাবে ছিল এবং এভাবেই জন্মভূমি গফরগাঁও ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে এসে এক সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি চলে যান বার্মায়। প্রায় বারো বছর বার্মায় কাটানোর পর দেশে ফিরে আসেন; বিয়ে করেন আমেনা খাতুনকে। শহীদ আবদুল জব্বারের পাকিস্তানের প্রতি ছিল চরম বিতৃষ্ণা। তিনি পাকিস্তানকে 'ফাহিস্তান' বলে উপহাস করতেন। শহীদ জব্বার শাশুড়ির চিকিৎসা করতে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ভাষা আন্দোলনের সমাবেশে হাজার হাজার বাঙালি অংশ নিলে তিনিও তাতে অংশ নেন। সেই আন্দোলনে পুলিশ গুলি চালালে যারা শহীদ হন, আবদুল জব্বার তাঁদের অন্যতম।

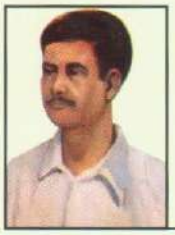

আবদুস সালাম : শহীদ আবদুস সালাম অর্থাভাবে বেশিদূর লেখাপড়া করতে পারেননি। ফেনীর দাগনভূঁইঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৯২৫ সালে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। শহীদ আবদুস সালাম দাগনভূঁইঞা কামাল আতাতুর্ক হাই স্কুলে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তারপর চাকরির সন্ধানে ঢাকা এসে সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিস বিভাগে পিয়ন পদে চাকরি পান। ঢাকায় তিনি ৩৬/বি নীলক্ষেত ব্যারাকে বাস করতেন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে ছাত্র জনতা সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শহীদ আবদুস সালাম তাতে অংশ নেন। সেই বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত হলে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তাঁর লাশ আজিমপুর করবস্থানে দাফন করা হয়েছিল।

আবদুল আউয়াল : শহীদ আবদুল আউয়াল পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শহীদ হন ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যখন ছাত্র বিক্ষোভ চলছিল, তখন আবদুল আউয়াল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বয়স ২৬ বছর । পিতা মোহাম্মদ হাশিম। সে সময় শহীদ আউয়ালের ঢাকার ঠিকানা ছিলা ১৯, হাফিজুল্লাহ রোড। শহীদ আউয়াল সম্পর্কে এর বেশি তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

অহিউল্লাহ : শহীদ অহিউল্লাহ ৮/৯ বছরের বালক। অহিউল্লাহর পিতা হাবিবুর রহমান, পেশা রাজমিস্ত্রি। ১৩৬২ সনের ১১ই ফাল্গুন সাপ্তাহিক নতুন দিন পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি নবাবপুর রোডে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে অহিউল্লাহ গুলিবিদ্ধ হন, গুলি লাগে তাঁর মাথায়। পুলিশ অতি দ্রুত তাঁর লাশ ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেয়, গায়েব করে দেয়।

প্রচীন মেসোপোটেমীয় লিপি

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

৯ ফাল্গুন ১৪২১
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বাণী

মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫' উপলক্ষে আমি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। সেই সাথে মহান ভাষা আন্দোলনে শহীদদের অম্লান স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

অমর একুশে বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। আমি আজ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ভাষাশহীদ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা অসংখ্য শহীদদের। সেইসাথে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সৈনিককে। তাঁদের অসীম সাহসিকতা, দক্ষ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও ত্বরিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এ আন্দোলনের মাধ্যমে। অমর একুশে অবিনাশী চেতনা হয়ে পরবর্তীকালে স্বাধিকার ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমাদেরকে যুগিয়েছে অসীম প্রেরণা ও শক্তি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ বিশ্বে বিরল ঘটনা। পৃথিবীতে বোধকরি বাঙালিই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে জীবন দিয়েছেন। আমরা গর্ববোধ করি এই ভেবে যে, অমর একুশের চেতনা আজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আর এককভাবে আমাদের সম্পদ নয়; এটি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে বিশ্বের সকল ভাষাভাষীর প্রেরণার উৎসও। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়ে অন্যের ভাষা ও সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে নিহিত আছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল চেতনা। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর সব ভাষাভাষী মানুষের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হোক, পৃথিবীতে লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব – মহান ভাষা দিবসে এই কামনা করি।

আমি মহান 'শহীদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৫' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রাচীন মিশরীয় হায়েরোগ্লিফিকস

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৯ ফাল্গুন ১৪২১
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বাণী

মহান শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলা ভাষাভাষীসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এদিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, সালাম, বরকত ও জব্বারসহ আরও অনেকে।

আজকের এদিনে আমি ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই; শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এ দিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধুসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মুজিবুর রহমান। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

ঐ বছরের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবারও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তাঁর দিক-নির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারি করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহীদেরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারির সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিশ্বের ২৫ কোটি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা এবং ভাষা সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি।

অমর একুশে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা ও নিরক্ষরতামুক্ত এবং আধুনিক ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের সরকার দেশের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। গত ছয় বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছি।

আসুন, সকল ভেদাভেদ ভুলে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হই। পবিত্র সংবিধান ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখি। সন্ত্রাস, হানাহানির পথ পরিহার করে দেশ ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার শপথ নেই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

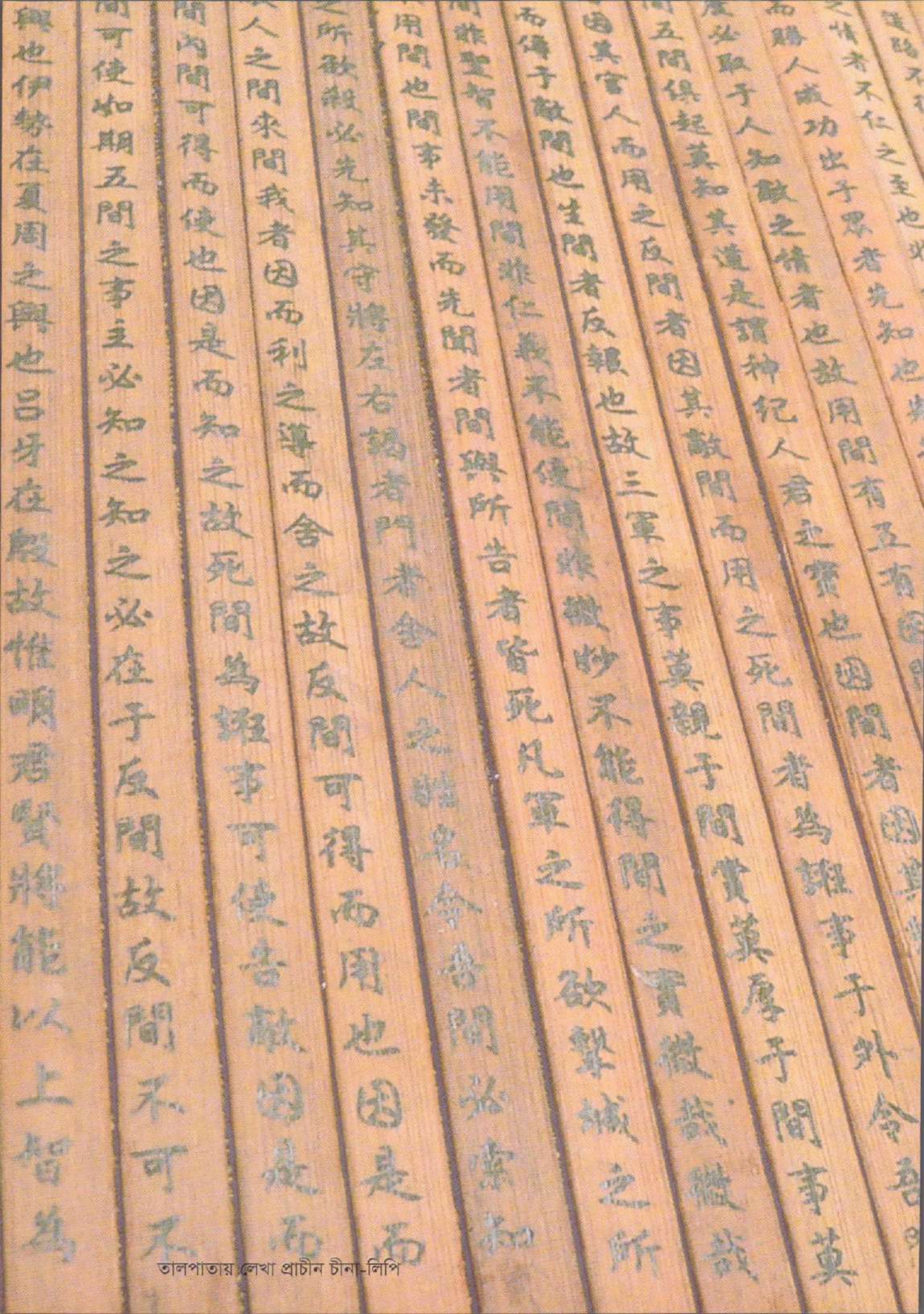

তালপাতায় লেখা প্রাচীন চীনা-লিপি

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ভাষা আমাদের সর্ব অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। মানুষ আছে; কিন্তু ভাষা নেই–এমন অবস্থা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। ভাষা আমাদের আবেগ, অনুভূতি, বিদ্বেষ ও ভালোবাসা প্রকাশের অনিবার্য মাধ্যমই শুধু নয়, আমাদের স্বকীয়তা, জাতিক স্বাতন্ত্র্য, ঐতিহ্য রক্ষা এবং চর্চারও প্রধান অবলম্বন। মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এখন বিশ্বের সর্বত্রই স্বীকৃত। ভাষিক বৈচিত্র্য রক্ষার আরও একটি গভীরতর দিক রয়েছে আর তা ধর্ম-বর্ণ-সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানুষকে শ্রদ্ধা করা। এ জাতীয় মনোভঙ্গি যতো অনুসৃত হবে ততোই মঙ্গল তাতে মানুষে মানুষে বিরোধ ও হানাহানি দূর হবে, সকলের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বশান্তি।

১৯৫২ সনে আমাদের ভাষিক সত্তা ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা অস্বীকার করে আমাদের জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকচক্রের সেই সাম্রাজ্যবাদী আচরণ এ দেশের মানুষ সহ্য করেনি। জাতিক অস্তিত্ব ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষায় তখন বাংলার তরুণসমাজ সাহসী ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। বুকের রক্ত দিয়ে তারা ছিনিয়ে এনেছে মাতৃভাষার অধিকার।

আমাদের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব বহুমাত্রিক। ভাষা-আন্দোলন কেবল আমাদের আত্ম-আবিষ্কার ও ভাষিক অধিকার অর্জনের স্মারক নয়, তা সকল অন্যায়, অবিচার ও আগ্রাসন প্রতিহত করে বৃহত্তর মানুষের জন্য মানবিক অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার প্রেরণা, আগ্রাসী শক্তিকে প্রতিহত ও পরাজিত করার আহ্বান। একুশে ফেব্রুয়ারিই আমাদের দানবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহসী হওয়ার ও বিজয় অর্জনে প্রণোদিত করেছে। একুশের শিক্ষায় দীক্ষিত হয়েই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের পরাজিত করে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা, নিজেদের স্বদেশভূমি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে পাকিস্তানের পরাজিত শক্তি ও তাদের এ দেশীয় কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং জাতীয় নেতৃবৃন্দকে আমরা হারিয়েছি। এ আঘাত অসহনীয় কিন্তু সেই বেদনাই জাতিকে পুনরায় জাগরিত ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উজ্জীবিত করেছে। বাংলার মানুষ জাতির জনকের কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারকে দেশ পরিচালনার ভার অর্পণ করেছে। ১৯৯৯ সনে তাঁরই সক্রিয় উদ্যোগেই জাতিসংঘ অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। এর অব্যবহিত পর তিনিই ঘোষণা করেন যে, বিশ্বের সকল মাতৃভাষার উন্নয়ন, বিকাশ, গবেষণা, আধুনিকায়ন বিশেষত, বিপন্ন ও বিলুপ্ত-প্রায় মাতৃভাষাগুলির পুনরুজ্জীবন ও প্রমিতায়নের জন্য ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তার কার্যক্রম শুরু করেছে এবং ক্রমান্বয়ে জনবল নিয়োগ, ভৌত অবকাঠামো ও গবেষণা সরঞ্জামাদি সংগ্রহের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে *বাংলাদেশের নৃভাষা-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা* কর্মসূচি সম্পাদনে নিয়োজিত হয়েছে। বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে ইউনেস্কো-র ক্যাটেগোরি-২ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে ইউনেস্কো-র ফিজিবিলিটি স্টাডি টিম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছেন। আমরা আশাবাদী, অনতিকালের মধ্যেই আমরা তা অর্জন করতে পারব। উল্লেখ করা যায় যে, সরকার মাতৃভাষার মাধ্যমে সকল শিশুকে অন্তত প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা দানের কার্যক্রম শুরু করেছে। ইনস্টিটিউটের গবেষণা আমাদের সাহায্য করবে। আমরা চাই, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আর কোনো জাতি ও ভাষিক সম্প্রদায়কে যেন প্রাণ দিতে না হয়।

আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ের অসম্পূর্ণ কাজের মধ্যে অন্যতম ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়াম নির্মাণ অনেক জটিলতা অতিক্রম করে এবার আমরা বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছি। এ বছরের একুশের অনুষ্ঠান এই অডিটোরিয়ামে সম্পন্ন করতে পারছি।

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের ভাষা-পরিকল্পনা ও ভাষা-ব্যবস্থাপনার জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন ছাড়া ভাষা-গবেষণার এপিসেন্টার বা আদর্শ কেন্দ্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিত লাভ করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.

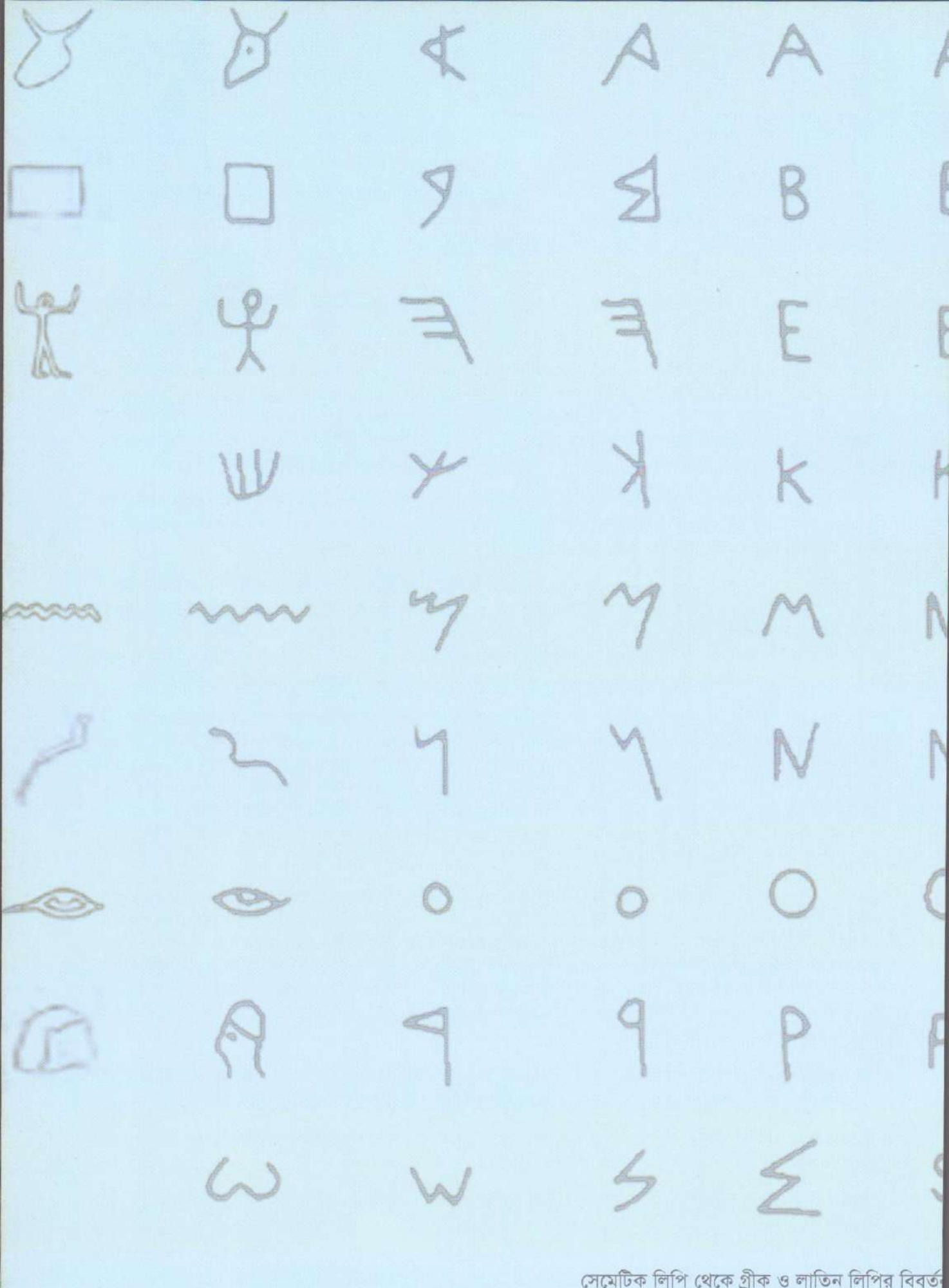

সেমেটিক লিপি থেকে গ্রীক ও লাতিন লিপির বিবর্তন

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
বাংলাদেশ প্রতিনিধি, কার্যনির্বাহী বোর্ড, ইউনেস্কো

বাণী

তুলনারহিত সেই এক উষাকাল
ঘুমভাঙা চোখে সাগর ডেকেছে বান
আমরা জেগেছি মাতৃরক্ত ছুঁয়ে
আমরা সবাই একুশে ফেব্রুয়ারি।

একুশ আমাদের সত্তা, চেতনা ও অনুভূতিতে মিশে আছে। আমাদের আত্ম-আবিষ্কার ও আত্মোপলব্ধি ঘটেছে একুশের মধ্য দিয়েই, এ উৎস থেকেই আমরা পেয়েছি মাথা নত না করার শিক্ষা। সে-অর্থে আমরা সবাই একুশেরই উত্তরাধিকার।

আমাদের আত্মমুক্তিতে, স্বমহিমায় ও নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত হয়ে উঠতে এবং নিজেদের ঠিকানায় শিকড়ায়িত হতে পাড়ি দিতে হয়েছে বন্ধুর পথ। এ পথপরিক্রমায় ধ্রুবতারার মতো আমাদের পথ দেখিয়েছেন, সাহস যুগিয়েছেন এবং সংগ্রাম করে নিজেদের অধিকার অর্জনের শিক্ষা দিয়েছেন এ মাটির শ্রেষ্ঠ সন্তান, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর জন্যেই আমরা পেয়েছি স্বতন্ত্র পরিচয়, স্বাধীন রাষ্ট্র। একুশে ফেব্রুয়ারির এই মহান দিনে আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের জাতিক পরিচয় নির্মাণে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, সক্রিয় ছিলেন এবং আছেন– তাঁদের সকলকে।

একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আর বাংলাভাষাভাষীর কিংবা একান্তই এ দেশবাসীর অর্জন বা সম্পদ নয়; এখন তা ভূরাজনৈতিক পরিসীমা অতিক্রমী এক প্রেরণা। সারা বিশ্বের মাতৃভাষাভাষীকে তা উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। পৃথিবী জুড়ে এই চেতনা পৌঁছে দিয়ে এবং সকল মাতৃভাষাভাষীকে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা সংরক্ষণে ও বিকাশের প্রেরণা সঞ্চার করেছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সেই বার্তাই বিশ্ববাসীর কাছে বয়ে চলেছে। ইনস্টিটিউটের ব্যাপ্তি ও কাজের পরিধি ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে।

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী

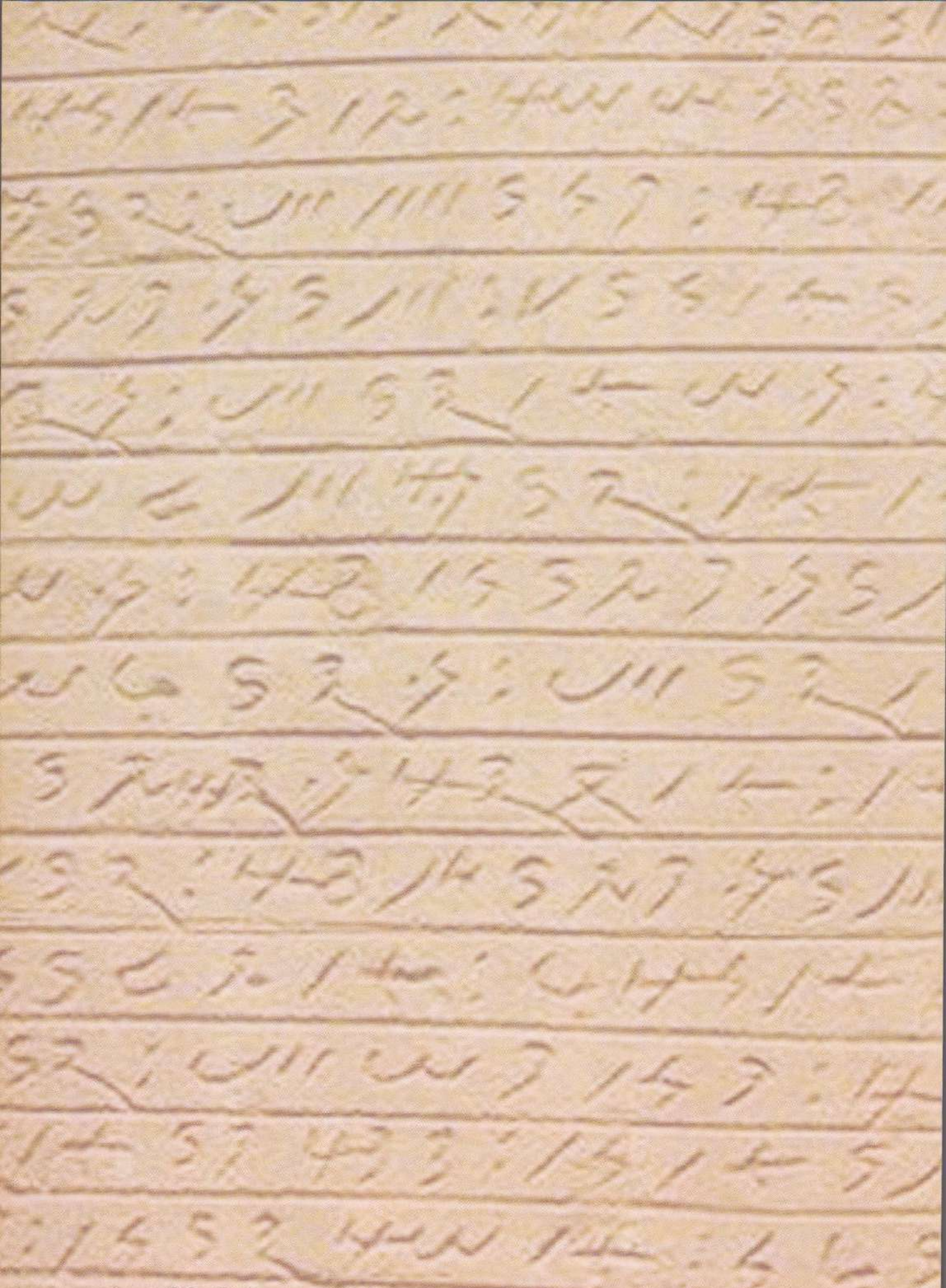

নাপাতান লিপি (খ্রি.- পূ. ৮০০-৬০০ খ্রি.)

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পৃথিবী একই, মানুষ হরেক, আফ্রিকা থেকে আমেরিকা, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে ''Out of Africa''। কেই সাদা, কেউ কালো কিংবা কেউ এর মাঝের নানা রঙের মিশ্রণের। ভিতরে সবার সমান মায়া, সমতা, হিংস্রতা। এক আবেগ, এক অনুভূতির মানুষের নানা রুচি, নানা খাদ্য, নানা স্বাদ। নানা ভাষার, নানান প্রাকৃতিক পরিবেশের মানানসই সংস্কৃতি, সাহিত্য, মানবাধিকার, মানবতা এক।

নানান ভাষা, নানান ভূপ্রকৃতিতে বিস্তৃত উৎস এক। আফ্রিকার ''ক্লিক''-এর ১৮০ ফোনেম হারিয়ে ৪৭ ফোনেমের বাংলা, প্রশান্ত পাড়ি দিয়ে ২২২ ফোনেম থেকে হারিয়ে কান্ত হাউয়াই ১৩ ফোনমের ভাষা। আমরা আমাদের বাংলাদেশ, ৪৭ ফোনেমের বাংলা ভাষা আফ্রিকা থেকে গড়াতে গড়াতে বাংলায় এসে আমাদের রক্তমজ্জায় পৌঁছে গেছে। তাই আমরা হারাতে চাই না, চাইনিও। অর্জিত হয়েছে বাংলা ভাষার অধিকার, সকল জাতির ভাষার ওপর তার নিজস্ব অধিকার একুশের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার অধিকার। আমাদের অহংকার সেই অধিকার ভোগ-দখল-চর্চা আর গবেষণার অধিকার ''আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট''-এর অঙ্গীকার। ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য, একই প্রতিষ্ঠান বহু ভাষার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক অভিভাবক লালনাধিকারিক।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বাংলার মাঝে সকল ভাষাধিকারের প্রতীক, অভিভাবক। আফ্রিকা থেকে আমেরিকা, ক্লিক থেকে হাউয়াই মাঝে বাংলা, একের মাঝে অনেক, ঐক্যের মাঝে বৈচিত্র্য। একই প্রতিষ্ঠান বহু ভাষার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক অভিভাবক লালনা বিকারিক। আমরা বাংলার মাঝে সকল ভাষা অধিকারের প্রতিফলন দেখেছি। ঐক্যের মাঝে বৈচিত্র্য এই সম্ভার রক্ষার জন্য আমরা নানা পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি। বহুল প্রচলিত-ব্যবহৃত ভাষার শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, স্বল্প মানুষের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ ও গবেষণা, বাংলার মাঝে সমগ্র পৃথিবীকে খুঁজে পাওয়া। নতুন করে পুনরুজ্জীবনের যাত্রা শুরু হওয়া। আমরা এই যাত্রাকে প্রতিবার ২১ ফেব্রুয়ারিতে নানা রূপে নানাভাবে দেখতে চাই। এরই মাঝে আমরা খুঁজে পেতে চাই আমাদের প্রিয় নেতা হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বুলি ''তোমরা আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না''। বাংলা অমর, বাঙালি অমর, কালজয়ী। পরিবর্তন শুধু সোনার বাংলা থেকে ডিজিটাল

মো. নজরুল ইসলাম খান

সুমেরীয় বাণমুখ লিপি

Director-General
UNESCO

Message

on the occasion of *International Mother Language Day*

Inclusive Education through and with Language -- Language Matters

21 February 2015

2015 marks the 15th anniversary of International Mother Language Day -- this is also a turning point year for the international community, as the deadline for the Millennium Development Goals, when countries will define a new global sustainable development agenda.

The focus for the post-2015 agenda must fall on the priority of advancing quality education for all -- widening access, ensuring equality and inclusiveness, and promoting education for global citizenship and sustainable development. Education in the mother language is an essential part of achieving these goals - to facilitate learning and to bolster skills in reading, writing and mathematics. Taking this forward requires a sharper focus on teaching training, revisions of academic programmes and the creation of suitable learning environments.

UNESCO takes forward these goals across the world. In Latin America, with the United Nations Children's Fund, UNESCO is promoting inclusive education through bilingual intercultural approaches, in order to include both native and non-native cultures. For the same reasons, the UNESCO Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific, based in Bangkok, Thailand, is working to deepen understandings of multilingual education based on the mother tongue, across the region and further afield. Mother tongue education is force for quality learning - it is also essential to bolster multilingualism and respect for linguistic and cultural diversity in societies that are transforming quickly.

Since 2000, there has been tremendous progress to reach the goals of Education for All. Today, we must look ahead -- to complete unfinished business and to tackle new challenges. International Mother Language Day is a moment for all of us to raise the flag for the importance of mother tongue to all educational efforts, to enhance the quality of learning and to reach the unreached. Every girl and boy, every woman and man must have the tools to participate fully in the lives of their societies -- this is a basic human right and it is a force for the sustainability of all development.

Irina Bokova

Irina Bokova

ア	阿	イ	伊	ウ	宇	エ	江
カ	加	キ	機	ク	久	ケ	介
サ	散	シ	之	ス	須	セ	世
タ	多	チ	千	ツ	川	テ	天
ナ	奈	ニ	仁	ヌ	奴	ネ	祢
ハ	八	ヒ	比	フ	不	ヘ	部
マ	末	ミ	三	ム	牟	メ	女
ヤ	也			ユ	由		
ラ	良	リ	利	ル	流	レ	礼
ワ	和	ヰ	井			ヱ	恵
ン	尓						

জাপানি লিপি

Head and Representative
UNESCO Office, Dhaka

Message

2015 marks the 15th anniversary of International Mother Language Day. It was the strong initiative of Bangladesh that International Mother Language Day (IMLD) was proclaimed 15 years back in the 30th session of the General Conference of UNESCO, and recognized by the UN General Assembly in its resolution establishing 2008 as the International Year of Languages.

The United Nations as a whole has a mission to promote linguistic diversity and multilingualism. By its mandate, UNESCO attaches great importance to the preservation and utilization of languages as the most important tool for communication and the means to transmit and preserve the cultural diversity of the world. Indeed languages have always been at the heart of UNESCO's mission and are mentioned in the very first Article of UNESCO's Constitution where the Organization is called upon to counteract any language-related discrimination. UNESCO is called upon "to contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations through education, science and culture...without distinction of race, sex, language or religion", and through "the wide diffusion of culture" and provision of "full and equal opportunities for education for all". This year at UNESCO's 70th anniversary this remains valid and important.

In recognition of the importance of language, all sectors of UNESCO, education, natural sciences and social and human sciences, culture and communication have developed language related programmes.

UNESCO Director General, Mrs. Irina Bokova, reminds us this year on the occasion of International Mother Language Day, that "since 2000, there has been a tremendous progress to reach the goals of Education for All. Today, we must look ahead - to complete unfinished business and to tackle new challenges. International Mother Language Day is a moment for all to raise the flag for the importance of mother tongue to all educational efforts, to enhance the quality of learning and to reach the unreached. Every girl and boy, every woman and man must have the tools to participate fully in the lives of their societies - this is a basic human right and it is a force for the sustainability of development."

UNESCO is appreciative with the ongoing efforts and commitment of the Government of Bangladesh in the cause of international mother language which is also expressed with the establishment of the International Mother Language Institute (IMLI) in Dhaka which will observe the International Mother Language Day 2015 with a three-day long programme including an international seminar on the "Preservation and Promotion of Mother Languages and Multilingualism: Scope to Make IMLI as a Research Hub"

Beatrice Kaldun

Beatrice Kaldun

আজটেক বর্ণমালা

আমার রক্ত দিয়ে তোমাদের রক্তদান নিশ্চয়ই শোধ করতে চেষ্টা করব

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আজ মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে আপনারা এখানে এসেছেন ১২.১ মিনিটের সময়। আমরা মাজারে গিয়েছি, সেখান থেকে সোজা এখানে এসেছি। বাঙ্গালিরা বহু রক্ত দিয়েছে। ১৯৫২ সাল থেকে যে রক্ত দেওয়া শুরু করেছে, সে-রক্ত আজো শেষ হয় নাই। কবে শেষ হবে তা জানি না।

আজ শহীদ দিবসে শপথ নিতে হবে, যে পর্যন্ত-না সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের অধিকার আদায় করতে না পারবে, সে পর্যন্ত বাংলার মা-বোনেরা, বাংলার ভাইয়েরা আর শহীদ হবে না, গাজি হবে।

আমরা জানি যে, ষড়যন্ত্রকারীরা ১৯৫২ সালে গুলি করে আমার ভাইদের শহীদ করেছিল, আজও তারা তাদের কাজ শেষ করে নাই। ষড়যন্ত্র আজও চলছে, ষড়যন্ত্র ভবিষ্যতে চলবে। কিন্তু বাংলাদেশের চেহারাটা দেখে নাই। এ আন্দোলন ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে শুরু হয়। ১৯৫২ সালে আমাদের ভাইয়েরা রক্ত দিয়ে প্রমাণ করেছে, আমরা বাংলা ভাষাকে অমর্যাদা করতে দেব না। রক্তের বিনিময়ে হলেও বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করব। ইনশাল্লাহ্ বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। আজ যারা বাংলার স্বাধিকারকে দমাতে চায়, আজ যারা বাংলার সংস্কৃতিকে, বাংলার মানুষকে লুট করতে চায়, কলোনি করতে চায়, বাজার করতে চায়, এত বড় বিজয়ের পরও ষড়যন্ত্র করতে চায়, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, ১৯৫২ সালের বাঙ্গালি আর ১৯৭১ সালের বাঙ্গালিদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আজ পবিত্র ভাষা দিবস, আজ আমি বেশি কিছু বলতে চাই না, আপনাদের সামনে এতটুকু বলতে চাই, আমাদের বাংলাদেশের ভাইয়েরা বোনেরা রক্ত দিয়ে দেখাইয়া গেছে দরকার যদি হয়, আমরা বাংলার মানুষ রক্ত দিতে জানি।

...যতদিন পর্যন্ত বাংলা থাকবে, বাংলার আকাশ থাকবে, বাংলার মাটি থাকবে, বাংলার মাটিতে মানুষ বেঁচে থাকবে– ততদিন পর্যন্ত আমরা একুশের শহীদদের কথা কেউ ভুলতে পারব না।

আজ এই শহীদ দিবসে শহীদদের আত্মার কথা মনে করে– যারা শহীদ হয়েছে ১৯৫২ সালে, ১৯৫৪ সালের অত্যাচার, ৫৮ সালের অত্যাচার, ৬২ সালের শহীদ, ৭ই জুনের শহীদ, গত গণ-আন্দোলনের শহীদ– যাদের চিনি না– নাম জানা-অজানা কত ভাই রক্ত দিয়েছে, বাংলার ঘরে-ঘরে শহীদ হচ্ছে। আজ মানুষ শুধু গুলি খেয়ে শহীদ হচ্ছে না, না খেয়ে শহীদ হচ্ছে। কাপড় পায় না, পেটে খাবার নাই, শোষণ করেই যাচ্ছে– বাংলার মানুষকে বদার (গ্রাহ্য) করছে না, বাংলার মানুষকে লুট করেছে– বাংলার মানুষকে পথের ভিখারি করেছে। আমরা কারোর উপর বে-ইনসাফি করতে চাই না। পাঞ্জাবি তার অধিকার পাক, বেলুচিস্তান অধিকার পাক, আমিও বাঙ্গালি, আমিও আমার স্বাধিকার চাই এখানে আপস নাই।

তাই আপনাদের কাছে আজকে আমি অনুরোধ করব, বাংলার ঘরে ঘরে যান। প্রস্তুত হয়ে যান। বাংলাদেশের ভাইয়েরা আর শহীদ নয়, বাংলার ছেলেদের গাজি হয়ে মা-র কোলে ফিরে যেতে হবে। শহীদ নয় গাজি। আর নয়। আমাদের ভাইদের কথা আমরা ভুলতে পারি না। যাদের মা আজো কাঁদে, যাদের বাপ আজো কাঁদে, যাদের ছেলে-মেয়ে আজো বাপ-বাপ মা-মা বলে চিৎকার করে বেড়ায়; তাদের আত্মা বাংলার ঘরে-ঘরে, বাংলার দুয়ারে-দুয়ারে

আজকে আঘাত করছে, বলছে, বাঙ্গালি তুমি কাপুরুষ হয়ো না, বাংলায় তুমি জানের ভয় কোরো না। বাঙ্গালি তুমি সংগ্রাম করে এগিয়ে যাও। তাই শহীদ দিবসে আমরা শপথ নিয়েছি, রক্ত দেব, দাবি ছাড়ব না, দাবি আদায় করে ছাড়ব।

আপনাদের কাছে আমার আবেদন রইল, ভাইয়েরা, সামনে আরো কঠিন হবে বলে আমার মনে হচ্ছে– ষড়যন্ত্রকারীরা থামে নাই, তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা সকলের সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব কামনা করি। তার অর্থ এই নয় যে, আমার সাতকোটি মানুষকে তারা গোলাম করে রাখবে। তার অর্থ এই নয় যে, আমার দেশকে কেউ গোলাম করে রাখবে। যে রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষ একদিন আগরতলা থেকে আমাকে বের করে নিয়ে এসেছিল– আমি ওয়াদা করতে পারি তোমাদের কাছে, এই শহীদ দিবসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমার রক্ত দিয়ে তোমাদের রক্তদান নিশ্চয়ই শোধ করতে চেষ্টা করব।

তাই আজ আপনাদের কাছে বলে যাচ্ছি, জীবনে মানুষ পয়দা হয় মৃত্যুর জন্য। বেঁচে আছি এতো একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আজ ঘুরছি, কালই মরে যেতে পারি। যাঁরা মরে গেছেন তাঁরা পথ দেখিয়ে গেছেন। যাঁরা শহীদ হবেন তারাও পথ দেখিয়ে যাবেন, ভবিষ্যৎ বংশধর – তারা বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে ... বলতে পারবে, আমি বাঙ্গালি, আমি মানুষ, আমার স্বাধিকার আছে, আমার অধিকার আছে। তাই আজকে শহীদ দিবসে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, ঘরে-ঘরে আপনারা দুর্গ গড়ে তোলেন। আমরা সকলের সহানুভূতি, ভালোবাসা চাই। কারো বিরুদ্ধে আমাদের হিংসা নাই। কেউ যদি অন্যায় করে আমাদের উপর শক্তি ব্যবহার করতে চায় নিশ্চয়ই এ দেশের মানুষ আর সহ্য করবে না। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, যতদিন পর্যন্ত বাংলা থাকবে, বাংলার আকাশ থাকবে, বাংলার মাটি থাকবে, বাংলার মাটিতে মানুষ বেঁচে থাকবে– ততদিন পর্যন্ত আমরা একুশের শহীদদের কথা কেউ ভুলতে পারব না। কারণ ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে এই ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না আমার বাংলার মাটিতে ছাড়া। এ আন্দোলনে আমিও জড়িত ছিলাম। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ তারিখে আমি গ্রেফতার হয়ে জেলে যাই। ১৯৫২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অনশন ধর্মঘট করি আর আমার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করি, তারা একুশ থেকে আন্দোলন শুরু করবে। ২৭ তারিখে আমাকে বের করে দেওয়া হয় জেল থেকে। আমি মরে যদি যাই জেলের বাইরে যেন মরি। এই আন্দোলনের সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম, আজও জড়িত আছি। জানি না কতদিন থাকতে পারব। আমি প্রস্তুত আছি, তবে আপনাদের কাছে আমার বলার এইটুকু রইল যে, এই বাংলা যেন আর অপমানিত না হয়; আর এই শহীদ যারা হয়ে গেছে তাদের রক্তের সাথে বেঈমানি যেন আমরা না করি। মনে রাখবেন, আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন এবং জানেন শহীদের রক্ত কখনোই বৃথা যায় নাই এবং যাবেও না ইনশাল্লাহ্। তাই আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি এই রাত্রি বেলা। জানি না কবে দেখা হয় আপনাদের সঙ্গে। আপনারা প্রস্তুত হয়ে যান, ইনশাল্লাহ্ যখন রক্ত দিতে শিখেছি, বাঙ্গালি তার দাবি আদায় করবে। আসসালামু আলাইকুম। শহীদ স্মৃতি অমর হোক। *

মাতৃভাষার অপমান
কোন জাতি সহ্য করতে পারে না।

– বঙ্গবন্ধু

* ১৯৭১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে প্রদত্ত ভাষণ। সূত্র : এ এইচ খান (সম্পাদিত)। ২০১১। *জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ* (দ্বিতীয় খণ্ড)।

একুশ শতকে বাংলাভাষা

রফিকুল ইসলাম

ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলাভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাংলাভাষার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদালাভ যুগান্তকারী ঘটনা এবং এ দৃষ্টান্ত অবশ্যই বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বিশ্বের প্রধান ছয়টি ভাষার মধ্যে অন্যতম বাংলাভাষা। বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যার অনুপাতে এই বিন্যাস। বাংলা মূলত দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের ভাষা যেমন– বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সংলগ্ন ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং অসম রাজ্যের বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শিলচর, করিমগঞ্জ, কামরূপ, গোয়ালপাড়া ও ধুবরি প্রভৃতি অঞ্চল বাংলাভাষী। মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলের রোসাং অধিবাসীরাও বাংলাভাষী। উপমহাদেশের বাইরে যুক্তরাজ্য, ইতালি এবং যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাভাষীদের স্থায়ী আর মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে অস্থায়ী আবাস গড়ে উঠেছে। মোটকথা বাংলাভাষার সীমানা বর্তমানে দক্ষিণ-এশিয়া ছাড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত। একুশ শতকে বাংলা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বা সরকারি ভাষা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসম রাজ্যের অন্যতম সরকারি ভাষাও বাংলা। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পৃথিবীর বাংলাভাষীর সংখ্যা আনুমানিক তিরিশ কোটির কম হবে না। বাংলা বর্ণমালা বাঙালি মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সব সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। বাংলাভাষার বহু আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বা উপভাষা থাকলেও তার একটি সর্বজনীন প্রমিতরূপ রয়েছে যা বিভিন্ন রাষ্ট্রসীমা অতিক্রমকারী এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী বাঙালির আনুষ্ঠানিক এবং ইলেকট্রোনিক প্রচারমাধ্যমের ভাষা। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। একুশ শতক তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের যুগ। বাংলাভাষা একুশ শতকে তথ্য-প্রযুক্তিনির্ভর একটি আধুনিক ভাষা। বিশ্বের বাংলাভাষী মানুষের প্রকাশনাশিল্প ও বর্তমানে কমপিউটার প্রযুক্তিনির্ভর। যোগাযোগের ভাষা হিসেবে বাংলা একুশ শতকে মোবাইল ও ইন্টারনেট-নির্ভর। বিশ্বের বাংলাভাষী অঞ্চলের বেতার ও টেলিভিশনসহ প্রচার মাধ্যমগুলির ভাষা মূলত বাংলা হলেও বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, শিলচর, লন্ডন, নিউইয়র্ক, টরেন্টো প্রভৃতি অঞ্চলের বাংলাভাষী টেলিভিশনগুলির ভাষাবৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যদিও একটি আন্তর্জাতিক প্রমিত বাংলা উচ্চারণ সর্বজনগ্রাহ্য। বর্তমানে বাংলাসাহিত্য চর্চার প্রধান দুটি কেন্দ্র– কোলকাতা ও ঢাকা। এছাড়া আগরতলা, শিলচর, লন্ডন ও নিউইয়র্ককে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যচর্চা বিকশিত হয়ে উঠছে। পৃথিবীর বাংলাভাষী অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মাধ্যম বাংলাভাষা হলেও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। যোগাযোগের মাধ্যম এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষায় ইংরেজির প্রাধান্য বর্ধমান। মোবাইলের মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদানের ইংরেজি বর্ণমালার ব্যবহার প্রায় সর্বজনীন। বলা যেতে পারে, মোবাইল ফোনে বর্তমানে রোমান হরফে বাংলা চলছে। এমনকি নিরক্ষর ব্যক্তিরাও মোবাইলে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি বর্ণমালা ব্যবহার করছে। ফেসবুকের ক্ষেত্রে তা আরও প্রকট। এসব মাধ্যমে বাংলাভাষীদের মাতৃভাষাপ্রীতি কোনরূপ প্রভাব তেমন লক্ষ করা যাচ্ছে না। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও বাংলাভাষার প্রতি চরম উদাসীনতা লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যচর্চায় পশ্চিমবঙ্গে কী হচ্ছে বাংলাদেশের সাহিত্যানুরাগীরা সে বিষয়ে খবর রাখার চেষ্টা করলেও পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না।

এমনকি পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যানুরাগীরা আগরতলা, শিলচর বা করিমগঞ্জের সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী নয়। লন্ডন, নিউইয়র্ক বা টরেন্টোভিত্তিক বাংলা সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে ঔৎসুক্য আছে বলে মনে হয় না। বিষয়টি সবচেয়ে প্রকট টেলিভিশন মাধ্যমের ক্ষেত্রে। উপমহাদেশে টেলিভিশনের যাত্রা শুরু ১৯৬৫ সালে ঢাকা থেকে। কোলকাতায় টেলিভিশন অনুষ্ঠান শুরু হয় তার দশ বছর পরে ১৯৭৬ সালে। শুধু এই দশ বছর নয় পরবর্তী একদশকেও ঢাকা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসম রাজ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ত্রিপুরা ও অসমে কোলকাতা অপেক্ষা ঢাকা টেলিভিশন অনেকদিন আকর্ষণীয় ছিল। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি টিভির অনুষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমে কেব্‌ল্ ডিলাররা গ্রহণ করেন না। কেব্‌ল্ ডিলারদের উদ্যোগী হওয়া উচিত। এটা কি বিস্ময়কর নয় যে, বাংলাদেশে ভারতের বই পুস্তক আমদানি বা টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখার ক্ষেত্রে কোনো বাধা না থাকলেও ভারতে বাংলাদেশের টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখা যায় না বা বই-পুস্তক পাওয়া যায় না। একুশ শতকের অবাধ তথ্যপ্রবাহের ক্ষেত্রে এটা কি একটা অযৌক্তিক ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়? এতে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হয়নি কিন্তু প্রতিবেশী বাংলাভাষী অঞ্চলের জন্য তা অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক।

বাংলাভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অতীত গৌরব কোলকাতা-কেন্দ্রিক। এর একটি কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ভিত্তিক উনিশ শতকের নবজাগরণ। কিন্তু বিশ শতকের অপরার্ধ থেকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলাভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাংলাভাষার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদালাভ যুগান্তকারী ঘটনা এবং এ দৃষ্টান্ত অবশ্যই বাংলাভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। একুশ শতকে যার লক্ষণ খুবই স্পষ্ট। বাংলাভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ঢাকা তথা বাংলাদেশের উপর। এক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রসঙ্গক্রমে প্রচারমাধ্যমের কথাও এসে পড়ে। ঢাকা কেন্দ্রিক স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলির অনুষ্ঠান ভারত ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দিবারাত্রি প্রচারিত হচ্ছে এবং এর মধ্য দিয়ে বাংলা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ রূপরেখা স্থির হয়ে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে, একুশ শতকে বাংলাভাষার এক নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এতে স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলার অতীত গৌরবের কিছুই উপেক্ষিত তো হচ্ছেই না, বরং বর্তমান বাস্তবতার উপর নির্ভর করে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার সাধনা চলছে। স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ আজ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। ফলে এক নতুন সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার সূত্রপাত ঘটেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ অগ্রযাত্রায় অনেক কঠিন ও জটিল বাধাবিপত্তি তাকে অতিক্রম করতে হচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সে তা পেরিয়ে যাচ্ছে। বাংলাভাষা বাংলাভাষীদের কঠিন জীবন সংগ্রাম ও ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণা। এ সাধনায় বাংলাভাষাও নতুন রূপ লাভ করছে। সে বিশ্বভাষায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

একুশের পূর্বসূরি রাজনীতিক ও একুশের মূল কারিগর ছাত্র-যুবসমাজ

আহমদ রফিক

ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে পরিচিত হলেও এর সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্র ও তাৎপর্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার যথার্থই বলেছেন : 'এই আন্দোলন একটি জতিসত্তাকে সংহত করে পরোক্ষভাবে হলেও একটি জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে তুলেছে।' এক্ষেত্রে ভিন্নমত থাকলেও এ কথা সত্য যে, কথিত জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি ভাষা-আন্দোলনে প্রচ্ছন্ন, যে আন্দোলন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেরণাও বটে।

এ আন্দোলনের মূল কারিগর বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, প্রধানত তাদের সন্তান ছাত্রযুবা। এ মধ্যবিত্তের বিকাশ ১৯ শতকের শেষার্ধে, প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায়। তখনো এদের সামাজিক ভিত্তি খুব মজবুত হয়ে ওঠেনি। মূলত ধর্মীয় সংস্কার ও নানামুখী মাদ্‌রাসা শিক্ষার কল্যাণে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বাধা পিছু হটার একটি বড়ো কারণ। হাতেগোনা কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ শ্রেণির প্রতিনিধি।

ভাষা তথা মাতৃভাষার প্রধান গুরুত্ব এর সর্বজনীন চরিত্রে। সে গুরুত্ব একুশের আন্দোলনে ও চেতনায় প্রতিফলিত। ওই সর্বজনীন চরিত্র আরো এ অর্থে গুরুত্বপূর্ণ যে ভাষা শ্রেণি- নির্বিশেষ।

অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের দক্ষিণে ও পশ্চিমের শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে যে বিত্তবান-সামন্ত-ধনিক ও বুদ্ধিদীপ্ত এলিট শ্রেণির দ্রুত বিকাশ তাদের একাংশের হাত ধরে ১৯ শতকে নবজাগরণ এবং তা উচ্চবর্ণ ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ যা এদের তৃণমূল স্তর বা মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর কোনো প্রভাব রাখেনি। এদের মধ্যে আধুনিক উদারচেতা অংশ সমাজসংস্কারে নিবেদিত, অন্য অংশ হিন্দুর প্রভাবিত নব্যজাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র তার *আনন্দমঠ* ও 'বন্দেমাতরম' গানের প্রভাব নিয়ে এদের মধ্যমণি।

সম্প্রদায়গত এই বিভাজিত চেতনা সেকালের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব রেখেছে, ধর্মকে জাতিকে গতি করে বিভাজনের মজবুত ভিত্তি তৈরি করেছে। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার এই প্রকাশে বাদ পড়ে না বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ বা হিন্দু ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের প্রচারক বিবেকানন্দ। রাজনীতিতে এভাবে ধর্মীয় চেতনার প্রভাব নিশ্চিত হয়।

অনুরূপ প্রতিক্রিয়া মুসলমান সমাজে একইভাবে দেখা দেয়। উঠতি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও স্বল্প সংখ্যক সামন্ত বা অভিজাত শ্রেণি একই ধারায় সক্রিয়। তবে এদের আর্থ-সামাজিক প্রতিযোগিতার শক্তি অপেক্ষাকৃত কম ছিল সন্দেহ নেই। স্বভাবে সেকুলার চেতনার বাঙালি সমাজও জাতিগঠনের রাজনৈতিক পথ চলায় এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ ঐতিহাসিক ঐক্য গড়ে ওঠেনি।

জাতি হিসেবে বাঙালির মানস গঠনে এবং জাতিরাষ্ট্র গঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এভাবে ইতিহাসের অসঙ্গতি ও অসমগতি (Historical Lag) এক অপ্রিয় সত্য হয়ে দাঁড়ায়। এর মূল কারণ আর্থ-সামাজিক বৈষম্য।

ভিন্ন মাত্রায় ওই অসঙ্গতির সূচনা অবশ্য উপমহাদেশ ভিত্তিক বঙ্গে প্রাচীনযুগ থেকে। সূত্রটি উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙালীর ইতিহাস* আদিপর্বে 'Historical Lag' তথা ইতিহাসের অসমগতি হিসেবে। তার ভাষায় প্রাচীন বাঙালীর ইতিহাসের অসমগতি পুষ্ট ও লালিত হইয়াছে বর্ণ ও শ্রেণিবিন্যাসের সহায়তায় (পৃ. ৬৯৯)। এর ধারাবাহিকতা মধ্যযুগ হয়ে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত। শেষোক্ত যুগে বিষয়টির রকম ফের ঘটেছে ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে তথা ভদ্রলোক শ্রেণিতে। বিশ শতকের রবীন্দ্রনাথও এর জের টেনেছেন একই জাতির একই শ্রেণির সম্প্রদায়গত ভিন্নতায়। একই সঙ্গে মুসলমান কৃষক-প্রধান গ্রাম ও হিন্দু মধ্যশ্রেণি-প্রধান শহর-নগরের আর্থ-সামাজিক ব্যবধান বিবেচনায়। তার বিচারে গ্রাম পড়ে আছে মধ্যযুগে, শহর আধুনিক যুগে, দুইয়ের মধ্যে মহাসমুদ্রের ব্যবধান। প্রসঙ্গত তিনি ভদ্রলোক শ্রেণি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিম্নবর্গীয় শোষণের কথাও উল্লেখ করেছেন।

একই বিষয়ে অধ্যাপক তরফদারের ভাবনা–এখনো কি সেই অসমগতির অবসান ঘটেনি? বাস্তবিকই ঘটেনি। নিকট অতীতে এর পেছনে আরো জ্বালানি যোগ করেছে ইতিহাসের সচেতন শক্তি হিসেবে উপনিবেশবাদী ইংরেজ শাসক শ্রেণি। 'স্বভাবতই জাতিগত চেতনা হয়ে উঠেছে ধর্মীয় চেতনাযুক্ত মিশ্র চরিত্রের। তাই এতে শুদ্ধ গণতন্ত্র, আধুনিকতা ও নির্ভেজাল সেকুলার জাতীয়তাবোধ শক্তিমান ও প্রধান দিকনির্দেশক হয়ে উঠতে পারে নি। এক দিকে হিন্দুত্ববাদের প্রচার অন্যদিকে মাওলানা মৌলবিদের সনাতন ইসলামে ফিরে যাবার পক্ষে আহ্বান (গ্রামে গ্রামে শুদ্ধি অভিযানও ঘটে) পরিস্থিতি ভিন্ন মুখী করেছে' (রফিউদ্দিন আহমেদ)।

এ দুই সম্প্রদায়ের অসম বিকাশের কারণে উঠতি মুসলমান মধ্যবিত্ত এবং তার উচ্চাভিলাষী শ্রেণির পক্ষে প্রতিযোগিতা মোটেই মসৃণ ও সহজ ছিল না। তাই তারা সহজেই সাড়া দেয় শাসকদের ডাকে প্রতিযোগিতামুক্ত পথে হাঁটতে, প্রতিষ্ঠা অর্জনের লক্ষ্যে। এদের প্রধান অংশ কিছু সংখ্যক ব্যতিক্রমবাদে 'রাজভক্ত' শ্রেণিতে পরিণত। এদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়ে জেল জুলুম নির্যাতনের শিকার হয়নি। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অনুসারী মি. জিন্নাহ-এর বড় উদাহরণ।

শাসক মদতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন রুখতে ১৯০৬ সনে ঢাকায় যে সম্প্রদায়বাদী রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা সে দলটিকে বরাবর সাহায্য, সমর্থন জুগিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন নিশ্চিত করেছে ইংরেজ শাসক। ইতিহাসের তথ্য এমনই। তাই শাসক গোষ্ঠী ১৯০৯, ১৯১৯, ১৯৩৫ সনে ক্রমান্বয়ে সম্প্রদায়বাদী শাসন সংস্কার আইন চালু করে। শেষোক্ত শিরোনামই তো 'কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড' এবং এগুলো ছিল দুই সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করার রাজনৈতিক হাতিয়ার। যেখানে গোটা ভারতে ব্রিটিশ শাসনে সম্প্রদায়ের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদী চেতনা এভাবে বিভাজিত হয়েছে, বিশেষ করে বঙ্গে যেখানে সম্প্রদায়গত আর্থ-সামাজিক বৈষম্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশাল অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক-কারিগর শ্রমজীবী শ্রেণিতে পরিণত। পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক অসমগতির পথ ধরে রাজনৈতিক অঙ্গনে ধর্মীয় ও শ্রেণিগত প্রভাবের কারণে স্বদেশ চেতনার সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেনি। এক্ষেত্রে কথিত ভদ্রলোক শ্রেণির (হিন্দু-প্রধান) দায়ও কম নয়।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান অংশ, হিন্দু মহাসভা ও বিপ্লববাদী সংগঠনগুলো এ বিষয়ে একই মঞ্চে। বিষয়টি পূর্বোক্ত এলিট শ্রেণিরই কয়েকজন সচেতন ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন। তাদের লেখায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির শ্রেণি-স্বার্থপরতা থেকে ভূস্বামী, মহাজন ও মধ্যস্বত্ব ভোগীদের শোষণ নির্যাতনের তথ্য উঠে এসেছে। যেমন লিখেছেন জ্যেষ্ঠ অশোক মিত্র ভদ্রলোক শ্রেণির নিম্নবর্গীয় শোষণের কথা তিনি লিখেছেন ন্যুব্জপৃষ্ঠ, কুব্জদেহ, হাড় জিরজিরে চাষীর পিঠে একের পর এক চৌষট্টি থাক বানর আরামে বসে চাষীর তৈরি কলা খাওয়ার কথা। যা এক অর্থে ইতিহাসের অসমগতির আধুনিক রূপ। এখানে প্রধান ভূমিকা পূর্বোক্ত ভদ্রলোক রাজনীতির।

বহুকথিত 'ভদ্রলোক' শ্রেণি সম্পর্কে এ কালের অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ গ্রুপের ইতিহাস ও সমাজবিদগণের বিচার-ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্ররচনায় এই 'ভদ্রলোক' শ্রেণির সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও সুবিধা ভোগের কথা উল্লেখিত। এই 'ভদ্রলোক' শ্রেণির সামাজিক-রাজনৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে দুই ভিন্ন মত একাধিক জনের, এমনকি মার্কসবাদী মহলেও। শেষোক্তদের একাংশ

যেমন নরহরি কবিরাজ প্রমুখ মার্কসবাদী লেখক ভদ্রলোক শ্রেণির গণতান্ত্রিক চেতনা ও উদার স্বদেশিকতার বিষয়গুলো বড় করে দেখেছেন যে শ্রেণি কবি সমর সেনের তীর্যক মন্তব্যে 'সেকলের বিষবৃক্ষের ফল'।

এ ধরনের নেতিবাচক মূল্যায়নে উল্লেখযোগ্য নাম অশোক মিত্র, সুশোভন সরকার, বিনয় ঘোষ, সুমিত সরকার প্রমুখ। অশোক মিত্র এদের সীমাবদ্ধতা ও আত্ম-প্রতারণার কথা বলতে গিয়ে 'ভারতীয় মার্কসবাদীদের বর্ণাশ্রম নিয়ে ভাবের ঘরে চুরি'র প্রসঙ্গ টেনেছেন যা এদের শ্রেণি চেতনার অপর পিঠ। এদের মধ্যে 'অল্পই তাদের সংখ্যা যারা নিজের চোখ দিয়ে দেখেন এবং নিজের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন।

এই 'দেখা ও অনুভব'-এর অভাব বিভাজনের অন্যতম প্রধান কারণ যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভদ্রলোক শ্রেণির রাজনৈতিক ও সমাজ চিন্তার বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। যেমন অগ্রসর সম্প্রদায়ে তেমনি পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে। বিশদ বিবরণে না যেয়েও বলা চলে যে এই বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা দেশ বিভাগোত্তর কালেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত এলিট ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণিতে কখনো প্রকট, কখনো প্রচ্ছন্ন-আধুনিকতা এর পুরোপুরি অবসান ঘটাতে পারেনি।

এ চেতনা-বৈশিষ্ট্যের দুটো পিঠ। এক পিঠে ঔপনিবেশিকতার প্রভাব জাত শ্রেণি বৈশিষ্ট্য, অন্য পিঠে ধর্মীয় চেতনার পূর্বোক্ত দ্বিমাত্রিক প্রভাব। হিন্দু সম্প্রদায়ে এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন 'জেমসমিল ও মনুর সংমিশ্রণ' হিসাবে (সূত্র : সাংবাদিক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়)। এ স্ববিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' বনাম *আনন্দমঠ*-এর বৈপরীত্যে। এমন উদাহরণ নেহাৎ কম নয়।

মুসলমান সমাজেও অনুরূপ বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতার প্রকাশ দেখা গেছে। যেমন উনিশ শতকে তেমনি পরবর্তী সময়ে। সাম্প্রদায়িক ব্যবধান বোধও একই মাত্রায় বিরাজমান। এসব ক্ষেত্রে তৃতীয় শক্তি তথা শাসকশ্রেণির ভূমিকাও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আশ্চর্য যে বিশ শতক পেরিয়ে বিশ্ব আধুনিকতার প্রভাব সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে পূর্বকথিতদের উত্তরসূরির অভাব ঘটেনি। এদের শনাক্ত করা যায় উভয় সম্প্রদায়ে রাজনীতিক, আমলা, শিল্পপতি-ব্যবসায়ী, আইনজীবী, উচ্চবর্গীয় শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের গরিষ্ঠ অংশে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও সুবিধাভোগের পন্থা এদের চিন্তনের বিষয়। শাসনযন্ত্রের দড়িদড়া এদের প্রতিনিধি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের হাতের মুঠোয়। বহিরঙ্গে আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও এরা ধর্মীয় অনাধুনিকতা থেকে মুক্ত নয়। মুক্ত নয় সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির প্রভাব থেকে। বিদেশি স্বার্থ ও স্বশ্রেণির স্বার্থরক্ষা এদের প্রধান লক্ষ্য এবং নিম্নবর্গীয় বা ভূমিপুত্রদের স্বার্থ সম্পর্কে এরা উদাসীন। সম্প্রদায়গত সমন্বয় এদের রাজনীতিতে প্রাধান্য পায়নি এবং এখনো পায় না। এদের বিপরীতে ব্যতিক্রমিরা সংখ্যায় ও শক্তিতে যথেষ্ট নয়। সমাজে তাই এদের প্রভাব গুরুত্বহীন।

বিভাগ পূর্বকাল থেকে বিভাজিত চেতনার এই ভদ্রলোক তথা মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণির চেতনা বহন করে বিভাগোত্তর ও স্বাধীনতা উত্তর কালের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ ও রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় চেতনার এক অদ্ভুত মিশ্র চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে যা আদৌ আকাঙ্ক্ষিত ছিল না। এ কারণে সেকুলার জাতীয়তাবাদ ও সর্বজনীন স্বাদেশিকতার চেতনা ক্রমাগত পিছু হটছে। আধুনিক চেতনার গণতান্ত্রিক জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াও হালে পানি পায়নি।

এমনকি একটি সর্বজন সংশ্লিষ্ট যুদ্ধ শেষে উদ্ভূত বাংলাদেশে 'সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু' তত্ত্বের অগণতান্ত্রিক চেতনার অবসান ঘটেনি। জিন্নাহ্‌র পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও জিন্নাহ্‌র ওই তত্ত্বের প্রভাব থেকে মুক্তি মেলেনি। তাই ভাষিক জাতীয়তার চেয়ে ধর্মীয় চেতনার জাতীয়তাবাদ, এর প্রতীক ও অনুষঙ্গাদিসহ সমাজ ও রাজনীতি থেকে দূর হয়নি। বহিরঙ্গের চেয়ে এরা চেতনায় শক্তিমান।

তাই সামরিক শাসকদের কল্যাণে সেকুলার জাতীয়তার চেয়ে শক্তিমান হয়ে উঠেছে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের মিশ্র রূপ। রাষ্ট্রের মাথায় চেপেছে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম'–নব্বই শতাংশ মুসলমান অধিবাসীর দেশে যে আরোপ যুক্তিহীন। গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্র শক্তিহীনা বিনা প্রতিবাদে সেকুলার সংবিধানের শিরশ্ছেদ। এই মানসিকতার প্রভাবে সমাজে নানা অজুহাতে সম্প্রদায় চেতনার প্রকাশ।

বিস্ময়কর যে ঘাতক সাঈদি'র চাঁদে মুখ দেখার প্রচারে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনাও দেখতে হয়। প্রতিরোধ তৈরি হয় না। তাতে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদীদের অংশগ্রহণের অভিযোগ ওঠে। সর্বোপরি ধর্মীয় মৌলবাদী উগ্রপন্থী ইসলামিক জঙ্গিবাদের উত্থান। একুশের চেতনা বা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে একে মেলানো যায় না, যায় না জামায়াতে ইসলামের এতটা বাড়বাড়ন্ত। বিশেষ করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এর প্রভাব পড়ে রাষ্ট্রিক চরিত্রে।

সামাজিক-রাজনৈতিক এই নৈরাজ্য অসমগতির হিসাব মিলাতে যুক্তিবাদী মানুষ হিমশিম খাচ্ছেন। নানাবিধ ব্যাখ্যায় আত্মরক্ষার চেষ্টা চলছে। গণতান্ত্রিক চেতনার বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের আদর্শিক চেতনার এই পিছুহটা মেনে নিতে পারছেন না, বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তিও খুঁজে পাচ্ছেন না। এ এক উদ্ভট পরিস্থিতি।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও শ্রেণি-নির্বিশেষ একটি জাতীয়তাবাদী সশস্ত্র লড়াই শেষে স্বাধীন স্বদেশে সেকুলার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়তে না পারা, সমাজ বদল ঘটাতে না পারার পরিণাম বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক নৈরাজ্য ও পশ্চাদগতি। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার পথ ধরে নয়া উপদ্রব জাতি চেতনার রাজনৈতিক বিভাজন–বাঙ্গালি বনাম বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্যমূলক তত্ত্ব।

নিঃসন্দেহে এতে প্রকাশ পেয়েছে ক্ষমতা ও শাসনতান্ত্রিক অসুস্থতার রাজনৈতিক প্রতিফলন, গণতান্ত্রিক সুশাসনের অভাব। এতে পরিস্ফুট সেনাশাসক জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার কৌশলী লক্ষ্য। যে অগণতান্ত্রিক রাজনীতি পরবর্তী স্বৈরশাসক এরশাদেরও রাজকীয় নীতি। এতে সম্প্রদায় চেতনার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অনস্বীকার্য। সেই পুরাতন ধারায় ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের নীতি।

অতীত রাজনীতি থেকে হিসাব টানতে গেলে দেখা যায় ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ থেকে সম্প্রদায়বাদী রাজনীতির সহিংসতায় ভূখন্ড বিভাজন, বিভাজিত ভূখন্ডে সেকুলার জাতীয়তাবাদী লড়াই শেষে অর্জিত স্বাধীন স্বদেশে ধর্মীয় রাজনীতির প্রত্যাবর্তন ও জাতীয়তাবাদী বিভাজন এবং ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান যা রাজনীতির নৈরাজ্যিক পরিহাস বলে মনে হতে পারে। কিংবা ইতিহাসের অসমগতির উদাহরণ। অবস্থা বিশ্লেষণে প্রশ্ন উঠতে পারে, পূর্বোক্ত সেকুলার গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ কতটা সেকুলার ছিল। যা ছিল তা তাদের শ্রেণিস্বার্থ জড়িত জাতীয়তাবাদ যাতে নিম্নবর্গীয় স্বার্থের নিখাদ উপস্থিতি ছিল না। তাই জাতীয়তাবাদ নিয়ে এমন এক বিপাক।

দুই

এমন এক রাজনৈতিক আদর্শের চরিত্র নিয়ে মধ্য শ্রেণির জাতীয়তাবাদী প্রধানগণের পক্ষে নিঃস্বার্থ লক্ষ্য ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করা সম্ভব ছিল না। হয়তো তাই এগিয়ে আসে তারুণ্য তাদের আদর্শনিষ্ঠ কর্মসূচি নিয়ে। পাকিস্তানবাদী রাজনীতিকগণের পক্ষে বিরোধিতা ছিল স্বাভাবিক। ব্যক্তিস্বার্থে, দলীয় স্বার্থে। এদের অতি ছোট একাংশ স্বৈরাচারী পাকশাসনের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ ছিল রাজনৈতিক স্বার্থ-নির্ভর, শ্রেণিস্বার্থ নির্ভর। সেক্ষেত্রে শুদ্ধ গণতান্ত্রিক আদর্শ, সেকুলার সমাজ ও জনস্বার্থ তাদের লক্ষ্য ছিল না। আপসবাদ ও সুবিধাবাদ ছিল তাদের নীতি ও কৌশলে। বিস্ফোরক একুশে নিয়ে তাদের আচরণ তেমন প্রমাণ দেয়। যেমন ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিরোধিতা।

অন্য ভাষায় বলা যায় একুশের চেতনাকে ধারণ বা লালন করা নয়, একুশের অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তন ঘটানো নয়, বরং সে শক্তির নিয়ন্ত্রণ হাতের মুঠোয় নিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ পূরণই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। আন্দোলনে ছাত্রযুবা ও অন্যান্য নেতৃত্ব গ্রেপ্তার হবার পরিপ্রেক্ষিতে তারাই সে শূন্য স্থান পূরণ করেছে এবং ক্ষমতার দড়িদড়াগুলো মুঠোয় নিয়েছে। ২৭ এপ্রিলের সম্মেলন ও পরবর্তী ঘটনাবলী তার প্রমাণ। একুশের উত্তর প্রভাবে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ হয়েছিল সন্দেহ নেই। সে লক্ষ্যেই ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সুবিধাজনক পরিবেশে তারা শহীদ দিবস পালন ও জনসভার মাধ্যমে জনসমর্থন আদায় করেছে। সবই অতীত ধারাবাহিকতায় সুবিধাবাদী-সুবিধাভোগী রাজনীতির মহিমা।

কিন্তু ছাত্রযুবাদের ক্ষেত্রে বিষয়টা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা আদর্শবাদের টানে, ভাষিক মমত্ববোধে, জাতীয়তার রোমান্টিক আবেশে সর্বোপরি বাঙ্গালির আর্থ-সামাজিক

স্বাধিকার অর্জনের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলনে নামে। আপাত লক্ষ অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা, কিন্তু রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিপূরণে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়, আর দীর্ঘস্থায়ী লক্ষ্য জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার ব্যবহার নিশ্চিত করা। লক্ষ্য আদায়ে মরণপণ লড়াই। অভিজ্ঞতা সূত্রে বলা যায়, সংগ্রামী ছাত্র নেতৃত্বে বা সাধারণ ছাত্রযুবাদের মধ্যে রাজনীতিকদের মতো ব্যক্তিস্বার্থ, শ্রেণিস্বার্থের কোনো ভাবনা ছিল না। তারা লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেকোনো প্রকার আত্মত্যাগে দ্বিধাহীন ছিল। আর যে কারণেই তাদের সংগ্রামে সঙ্গী হয়েছেন আদর্শবাদী শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ, শ্রমজীবী বা সাধারণ মানুষ যে জন্য ছাত্র আন্দোলন দ্রুত গণ আন্দোলনে পরিণত হয় এবং তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সফলতা এবং আদর্শিক চরিত্রের প্রকাশ ঘটেছে।

আদর্শিক বিচারে এ আন্দোলনে ছিল সেকুলার জাতীয়তার গণতান্ত্রিক চেতনার প্রকাশ, ছিল সর্বজনীন জাতীয় স্বার্থ, জনস্বার্থের প্রকাশ। এর অংশ বিশেষে ছিল ঈঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ছায়াপাত যা একাধিক স্লোগানে পাকিস্তান বা ১৯৫৩ থেকে ক্রমবর্ধমান। ১৯৫৩ থেকে সম্ভাব্য পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতায় ছাত্র সমাজের গরিষ্ঠ অংশের সোচ্চার তৎপরতা তার প্রমাণ । এ সময় রাজনীতি ও সংস্কৃতি অঙ্গনে বিশেষত ছাত্র যুব সমাজে প্রগতি চেতনার প্রাধান্য লক্ষ্য করার মতো যা বলা বাহুল্য একুশে প্রভাব জনিত। পূর্ববঙ্গে পঞ্চাশের দশক হয়ে ওঠে ভাষার দশক যা জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্ভব ঘটায়। এর বিকাশ পরবর্তী দশকে–ষাটের দশক তাই জাতীয়তাবাদী চেতনার দশক, রাজনৈতিক ভাষ্যে বাঙ্গালি জাতিসত্তার মুক্তির দশক এবং যদিও মুক্তি ঘটেছে শ্রেণি বিশেষের, সর্বজনতার নয় ।

তিন

একুশে চেতনার ইতিবাচক প্রভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি যেমন সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার গুণগত চরিত্র বদলে (প্রমান সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য সম্মেলনগুলো) তেমনি রাজনীতিরও তাৎক্ষণিক চরিত্র ভিন্নতায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার বিজয় (১৯৫৪) এবং সেকুলার জাতীয়তাবোধের ক্রমবর্ধমান প্রকাশে (কুমিল্লা সম্মেলন থেকে ঢাকা হয়ে কাগমারি সাহিত্যসংস্কৃতি সম্মেলন স্মর্তব্য)। এ প্রভাব রাজনীতি ক্ষেত্রে ছিল অভাবিত। যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য তেমনি পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির জন্যও বটে। তবে রাজনীতি ক্ষেত্রে একুশের জাতীয়তাবাদী চেতনা পঞ্চাশের ছাত্রযুব নেতৃত্ব থেকে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রনে বিগত ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য প্রভাবে পরিপুষ্ট এক ধরনের মিশ্র চরিত্র অর্জন করে। একুশের ভাষিক চেতনা তখন আর পূর্ণ রূপে প্রতিফলিত হয় না।

রাজনীতির ক্ষেত্রে শুদ্ধ গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী, সেকুলার দেশাত্ববোধক জাতীয়তাবাদ পরবর্তীকালে বাস্তবের মাটিতে পা রেখেও পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হতে পারেনি সংকীর্ণ ধনবাদী অর্থনীতির টানে–যে ধনতন্ত্র কমপ্রেডর চরিত্র সম্পন্ন যা আবার বিদেশি বহুজাতিক কর্পোরেট পুঁজি দ্বারা প্রভাবিত। বিশ্ব বাজার অর্থনীতি যেখানে মহানিয়ন্ত্রক শক্তি, সেখানে রয়েছে শক্তিধর আমলাতন্ত্র যাতে রয়েছে বিগত ঔপনিবেশিক ভাষিক সংস্কৃতি ও একালের সম্রাজ্যবাদী-ভোগবাদী সংস্কৃতির গভীর প্রভাব। বিশ্ব পুঁজিবাদের সঙ্গে আমলাতন্ত্র ও শাসক শ্রেণির গড়ে উঠেছে গভীর আঁতাত।

বিশ্ব পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত এলিট মধ্যশ্রেণি, শাসক শ্রেণির স্বদেশি চেতনায় পাশ্চাত্য আধুনিকতার প্রভাব সত্ত্বেও ধর্মীয় জাতীয়তার পূর্ব প্রভাব ধুয়ে মুছে যায়নি বলে যত সমস্যা। এ প্রভাব যেমন বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে তেমনি এর উগ্ররূপ ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদে প্রতিফলিত। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে, সমাজে পূর্ব কথিত প্রচ্ছন্ন ধর্মীয় চেতনা ও আধুনিকতার এক অদ্ভুত মিশ্রণ বিরাজমান। এ সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ তুলে ধরা যায়।

ভাষা তথা মাতৃভাষার প্রধান গুরুত্ব এর সর্বজনীন চরিত্রে। সে গুরুত্ব একুশের আন্দোলনে ও চেতনায় প্রতিফলিত। ওই সর্বজনীন চরিত্র আরো এ অর্থে গুরুত্বপূর্ণ যে ভাষা শ্রেণি-নির্বিশেষ। গ্রামের কৃষক ও রাজধানীর মহানাগরিকের মুখের ভাষা তাদের মাতৃভাষা। সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিশীলিত ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে, হোক বুদ্ধিজীবীর সংস্কৃতি বা গণসংস্কৃতি, বহিরঙ্গের অদল বদলসহ। ভাষার এ গুরুত্ব ও চরিত্র জাতীয়তাবোধ ও সমাজচেতনায় ঐক্য ও মৈত্রী বন্ধনে সহায়ক। শ্রেণি বিশেষ বা শ্রেণি-নির্বিশেষে উভয় ক্ষেত্রে ভাষা হতে পারে

সংগ্রামের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। যে তাকে যেভাবে ব্যবহার করতে পারে । কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেণি বিশেষের শক্তি প্রধান হয়ে উঠলে জাতির সর্বজনীন স্বার্থে যত সমস্যা [প্রমান বাংলাদেশ]।

চার

আমাদের শিক্ষিত শ্রেণি, এলিট শ্রেণির রাজনীতি ভাষা আন্দোলনকে ব্যবহার করেছে পুরোপুরি তাদের শ্রেণিস্বার্থে– সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তাৎপর্যে; সর্বজন স্বার্থে নয়। কথাটা আগে বলা হয়েছে। অথচ ভাষা আন্দোলন শুধুই ছাত্রযুবা ও শিক্ষিত শ্রেণিস্বার্থের আন্দোলন ছিল না, ছিল জনস্বার্থেরও। ভাষা-আন্দোলনের প্রকৃত সফলতা, এর উত্তর-প্রভাব গণআন্দোলনের শক্তিতে ও চরিত্রগুণে। কিন্তু সে আন্দোলনের সুফল, স্বাধীনতার সুফল উল্লেখিত 'গণ' তথা সাধারণ মানুষ পুরোপুরি পায়নি। পায়নি শিক্ষার ক্ষেত্রেও। তাই গ্রাম বাংলায় অশিক্ষার অন্ধকার সামান্যই দূর হয়েছে।

একুশের মিছিলে মিছিলে উচ্চারিত স্লোগান অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে, যেমন উচ্চ শিক্ষায়, উচ্চ আদালতে মাতৃভাষার প্রচলনে উল্লেখিত শাসক শ্রেণির আগ্রহ দেখা যায় নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি নিয়ে গর্ব ও অহংকারের কমতি নেই। আন্তর্জাতিকতার অজুহাত তুলে ভাষিক জাতিরাষ্ট্রে মাতৃভাষার ব্যবহারে অনীহা। অথচ একাধিক বাঙালি মনীষী চীন, জাপান, কোরিয়ার উদাহরণ টেনে শিক্ষাসহ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মাতৃভাষা ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে গেছেন।

সম্প্রতি এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক ভাষা বিজ্ঞানী সম্মেলনে একই রকম পরামর্শ উঠে এসেছে। যেমন ১৯৯৬ সনের জুনে অনুষ্ঠিত ভাষাবিদদের বার্সেলোনা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে প্রতিটি ভাষিক জনগোষ্ঠীর সর্বস্তরে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহারের কথা। সুস্পষ্ট ভাষ্যে বলা হয়েছে 'সরকারি কার্যক্রমে মাতৃভাষা ব্যবহার, নিজ ভাষায় শিক্ষাদানের' কথা। সে সব পরামর্শ শ্রেণি স্বার্থের অচলায়তনে প্রতিহত হয়ে হাওয়ায় ভেসে গেছে।

চীন, জাপান, কোরিয়া বা উন্নত বিশ্বের কথা বাদ দিলেও আমরা উদাহরণ টানতে পারি অনেকগুলো ক্ষুদ্র জাতি রাষ্ট্রের যারা নিজ ভাষায় সব কর্ম সম্পন্ন করছে। যেমন '৩২ লক্ষ লিথুয়ানিয়ান, ৫০ লক্ষ ফিনিশিয়, ৫০ লক্ষ নরওয়েজিয়ান, ৫৬ লক্ষ স্প্যানিশ, ৮৭ লক্ষ সুইডিশ, ১ কোটি বুলগেরিয়ান, ৭.৫ কোটি তুর্কি, ৭ কোটি ভিয়েতনামি, ৮ কোটি কোরিয়ান ভাষী মানুষ। কম্পিউটার ও ইন্টারনেটে এই ভাষাগুলোর বিচিত্র বিষয়ে ব্যাপক ব্যবহার (সূত্র : পুষ্কর দাশগুপ্ত-মাতৃভাষা)।

অন্যদিকে ৩০ (মতান্তরে ৩৫) কোটি বাংলাভাষীর মাতৃভাষা অবহেলিত। আর ভাষিক জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের ১৬/১৭ কোটি বাঙালির ভাষা নিয়ে আমাদের হীনম্মন্যতার শেষ নেই। এর কারণ পূর্বোক্ত মিশ্র চেতনার শাসক, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবীর শ্রেণি চেতনা, শ্রেণি স্বার্থের প্রভাব। একমাত্র বৈপ্লবিক শ্রেণি সংগ্রামই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ইতিহাস সে ভবিষ্যতকে কবে বাস্তবে রূপ দেবে তার জন্য অপেক্ষা।

সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন কেন হচ্ছে না

কামাল লোহানী

আমরা পূর্ববাংলার আপামর জনসাধারণ বাংলায় কথা বলি। পাহাড়ে-সমতলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী নানান জাতিসত্তার হলেও বাংলায় প্রধানত কথা বলেন, লেখাপড়া করেন। এঁরা নিজ পরিবেশে কিংবা পরিবারে, হয়তো তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলেন। পঞ্চাশ-অধিক ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠীর সন্ধান পেয়েছি আমরা। এদের মধ্যে অনেকের নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা এমনকি সংস্কৃতিও আছে। কিন্তু তাঁদের মাতৃভাষা ক্রমশ বিলুপ্ত হতে চলেছে। এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের সাথে আমরাও দাবি করে চলেছি–শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত, যাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে, তাঁদের নিজ ভাষায় পড়ার সুযোগ দেওয়া হোক। আমাদের সবার এ মাতৃভূমি স্বাধীন হয়েছে তবু ইতোপূর্বে কোনো সরকারই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি। তবে বর্তমান সরকারকে সাধুবাদ জানাই, তারা এ দাবি মেনে নিয়ে সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী নিজ ভাষায় বাল্য শিক্ষার পাঠ গ্রহণ করতে পারবে।

বর্তমান মহাজোট সরকার যাদের নিজস্ব ভাষা এবং বর্ণমালা আছে, তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চার দশক উপেক্ষা–অবহেলার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেওয়ায় আমরাও কৃতজ্ঞ। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষও সন্তুষ্টি পেয়েছেন।

এঁদের মাতৃভাষার এমত স্বীকৃতি, এঁদের মধ্যে যাদের ভাষা আছে তাঁদের চর্চা ও সংস্কৃতি বিকাশেও সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারবে। বিলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে যাবে জাতিগত ঐক্য-ঐতিহ্য। একই সাথে একটি বিষয় স্মরণ করতে চাই, এঁরা কিন্তু কেবল পাকিস্তানি নিপীড়ন নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বেনিয়া শাসনের বিরুদ্ধে সাহসী সংগ্রামে অংশ নিয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীকে যেমন বিতাড়নে এক গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের অগ্রণী যোদ্ধা ছিলেন, দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পরও এই পূর্ববাংলার সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মতো নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন এবং সে কারণে সার্বক্ষণিক হুমকি এবং আতঙ্ক-আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন। মাতৃপ্রেম ও সহমর্মিতার কারণে শতবাধা অথবা আতঙ্ক থাকা সত্ত্বেও এঁরা বাংলা পরে পূর্ববাংলায় বৃহৎ জনগোষ্ঠী সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। পূর্ববাংলা যখন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন করছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র দম্ভোক্তি 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'-র বিরুদ্ধে, তখন পাহাড়ে-সমতলে বসবাস করা এই সব অবাঙালি মানুষগুলোও কিন্তু আমাদের দাবি, 'বাংলা'-কে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে'র সাথে সহমত পোষণ করেছিলেন এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নিগৃহীত নির্যাতিত হয়েছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। এঁরা কিন্তু বাংলাভাষার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি।

এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অগণিত মানুষ ব্রিটিশ আমলে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলেন। লিপ্ত ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহে, তেভাগার সংগ্রামে, নাচোল, হাজং, টঙ্ক, নানকার বিদ্রোহে। অসম সাহসিকতার সাথে লড়ে নিজের দাবি এবং বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর লড়াইয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। তাই তো দেখি এঁরাই আবার বাংলার তাবৎ জনগণের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনে কেবল যূথবদ্ধভাবে অংশগ্রহণই করেন নাই, প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন অকাতরে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, জীবন বলিদান এসবেরই সাক্ষ্য বহন করে। বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকারহীন মানুষগুলোর পাশে এঁরা তাই একই স্বার্থে, উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

এঁদের উপর নানা ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতন, গুম-অপহরণ, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন-অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে চলেছে নিরন্তর। এঁদের ভূমি বা পারিবারিক বসতভিটা লোপাট হয়ে যাচ্ছে আজও একটি বৈরী সন্ত্রাসী মহলের চক্রান্তে। এমন অবস্থায় ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের যে মহতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তাকে শতমুখে সাধুবাদ জানাই। ফলে প্রায় বিলুপ্ত ভাষা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতি রক্ষা পাবে আশা করি। তবে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই কাজটি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আমাদের কামনা রইলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে যথাশিগ্‌গিরই। আজ দুনিয়া যখন আমাদের রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করছে, তখন আমাদেরই তো কর্তব্য ছিল এই ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর প্রচলিত ভাষাকে স্বীকৃতি প্রদান এবং যথাযথভাবে চর্চার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কারণ আমাদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে অন্যতম দাবি ছিল : সকল আঞ্চলিক ভাষার সমান মর্যাদা দিতে হবে। দেশি, বিদেশি ঔপনিবেশিক সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী অপশক্তির হাত থেকে পুনরুদ্ধার হয়েছে, তখন তো এ দাবি আমাদের স্বেচ্ছায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাস্তবায়িত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গত ৪০ বছরে কত সরকারই তো এসেছে এবং গেছে। কেউই এ দিকটায় নজর দেননি। কিন্তু বর্তমান সরকার কাজটি করেছেন বলে জাতি হিসেবে আমরা কৃতজ্ঞ।

সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রচলন

আমরা ভাষা আন্দোলনকে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের সূচনালগ্ন বলে লেখায়, বলায়, নানা কারণে উল্লেখ্য ইতিহাসের একটি বৈপ্লবিক অধ্যায় হিসেবে বিবৃত করি। কিন্তু যথার্থ মর্যাদা দিতে আজও পারিনি। এ ধারণা কেবল আমারই নয়, সকলেরই। নয় কেবল কতিপয় আত্মতৃপ্তজনের বাংলাভাষার মর্যাদা অর্জনে যারা বিরোধিতা করেছিল, তারা আজও বাংলাভাষার বিরুদ্ধেও অপতৎপরতা চালিয়েই যাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, এর পাশাপাশি বাংলাভাষাকে নিয়ে গর্ব-গৌরব করি যারা, তাদের মধ্যেও বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি ব্যবহার করাকে 'আভিজাত্য' বা 'অ্যারিস্টোক্রেসি' বলে ভাবি। আমাদের এই উটকো প্রবণতার কারণে বাংলাভাষার প্রতি অমর্যাদা অনেকটাই সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, বহু বাড়ি ঘর, হাসপাতাল-ক্লিনিক, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম যত্রতত্র ইংরেজিতে রাখা হচ্ছে। রাস্তাঘাটে চলতে গেলে সড়কের দুধারে যেভাবে সব ইংরেজি নাম ও ইংরেজিতে লেখা নাম চোখে পড়ে তা সচেতন মানুষমাত্রেই তাজ্জব বনে যান। যে দেশের সন্তানেরা স্বয়ং-উচ্চারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং আপন প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেননি, যে শহর বন্দরের রাস্তা তরুণ ছাত্রদের খুনে রাঙা, সেইখানে কি করে বাংলাভাষা আজ এমনভাবেই অপমানিত। তাও যারা 'বাংলা'-কে উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল, সেই মৌলবাদী অপশক্তিকে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেছিলাম ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর, তাদের পলায়নের পর লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মুক্ত সেই স্বদেশ ভূখণ্ডে, আজ ইংরেজির প্রতাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে, পাশাপাশি আরবি ভাষারও কদর বেড়েছে মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করে অর্থ উপার্জনের লোভে। দোকানের সাইনবোর্ডেও বাংলা ভিন্ন অন্য ভাষা যে স্থান পাচ্ছে না, তা বলা যাবে না। তবে এক্ষেত্রে স্বৈরশাসক হলেও জেনারেল এরশাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। তাঁর আমলেই আন্তনগর ট্রেন সার্ভিস, নতুন নতুন রাজপথ নির্মাণ, সরকারি ভবন ইত্যাদির নাম তিনি বাংলায় করেছিলেন। এ জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। কিন্তু তাঁর অন্যান্য কথাবার্তা-গণতন্ত্রহীনতার কারণে ভালো কাজের আছর জনসাধারণের উপর পড়েনি। তাই উদারতার অজুহাতে অনেক স্বৈরতান্ত্রিকতাই সেদিন গ্রাস করেছিল বলে তার বিরুদ্ধে জনগণের দিনরাত্রির আন্দোলন জনগণকেই ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

বাঙালি কখনো অনুদার ছিল না। খোলামন নিয়ে বহিরাগতকে আলিঙ্গন করেছে, কিন্তু সে যখনই নিপীড়কের ভূমিকা নিয়েছে, তখনই প্রতিরোধের ঐক্যে তাকে রুখে দাঁড়িয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক মোসাহেবরা সেদিন ইংরেজ প্রভুদের পদলেহন করে বাংলার মাটিকে ওদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে ছিল, তখন কিন্তু স্বাধীনতার পবিত্র অঙ্গীকার বাংলার মাটি যে দুর্জয় ঘাঁটি, তা প্রমাণ করে দিয়েছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে

ন্যায়সঙ্গত তাই ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে চট্টগ্রাম যুবববিদ্রোহ, তেভাগার সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী যূথবদ্ধ লড়াই। ইংরেজ লোভাতুর স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দল ও নেতা অধ্যুষিত সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও নিখিলভারত মুসলিম লীগ-এর মধ্যে অখণ্ড ভারতকে খণ্ডিতই করে দিয়ে গেল না, বাংলাকে ভাঙ্গবার পুরোনো মতলবটাও হাসিল করলো। যাহোক, যখন দেশটাকেই বিভক্ত করে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক জনগণ ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকেই ভেঙ্গে ব্রিটিশরা এদেশ ত্যাগ করার মতলব আঁটলো, তখনই যে সংকীর্ণতা ঢোকাবার চেষ্টা করেছিল, তা অনেকটাই সফল হলো ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং মতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাধ মেটাতে। ওরাতো চলে গেল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত জনগণের হিন্দুস্তান-পাকিস্তান নামক নতুন রাষ্ট্রের উদয় ঘটলো। নতুন ক্ষমতা হাতে পেয়ে বিশেষ করে পাকিস্তানের দুটি অংশে–পূর্বে ও পশ্চিমে থেকে গেল হাজার মাইলের ব্যবধান এবং ভাষা ও সংস্কৃতি এমনকি বিপুল সম্পদের গর্বিত উত্তরাধিকার। নব্য শাসকদল সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি মুসলিম লীগ এবং তার নেতৃত্ব পূর্বাঞ্চলকে শোষণের নাগপাশে বেঁধে ফেলতে কৌশল আঁটলো এবং প্রথমেই আঘাত হানলো গোটা দেশটার তাবৎ জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর। পূর্ববঙ্গে তখন গড়ে চার কোটি লোকের বসবাস, যা পশ্চিমাংশের চেয়ে অনেক বেশি। অথচ এই জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষাকেই উপেক্ষা করে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অবজ্ঞা করলেন বাংলাকে এবং একতরফা ঘোষণা দিলেন : *Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan.* তাও আবার ঢাকায় যখন প্রথম এলেন এবং তাঁকে রেসকোর্স ময়দানে সংবর্ধনা দেওয়া হলো, তখনই তিনি এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এ দম্ভোক্তির প্রতিবাদ তাৎক্ষণিকভাবেই ঐ সংবর্ধনা সভাতেই হয়েছিল। তবে বিশাল জনসভার তুলনায় 'সাগরে বিন্দুবৎ' মনে হয়েছিল। পরদিন জিন্নাহ্ যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা করতে গিয়ে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে একই উক্তি পুনর্বার করলেন, তখন সেই প্রতিবাদী ছাত্ররাই 'নো নো' বলে চিৎকার করে তাদের মনোভাব 'কায়েদে আজম'-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তাঁকে তখন মুসলিম লীগ, কায়েদে আজম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠনেতা আখ্যায় ভূষিত করেছিল এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের সামনে কেউ 'টু' শব্দটি করার স্পর্ধা দেখাতে পারত না। কিন্তু যে পূর্ববাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে গণভোটে পাকিস্তানের পক্ষে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল, সেই পূর্ববাংলার জনগণকেই এমন উপেক্ষা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলাকে অসম্মান করার বিরুদ্ধে তরুণ ছাত্রসমাজ সচেতনভাবেই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ ছাত্র সমাবেশ থেকে শেষপর্যন্ত জিন্নাহ্ কার্জন হলের পেছন দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো– এ সময় পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি কিছুদিন পরেই পাকিস্তানের উজিরে আজম (প্রধানমন্ত্রী) হবার পুরস্কার পেলেন। সে ছিল ১৯৫২ সাল। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর নাজিমুদ্দিন এই সুযোগ পেয়ে গেলেন। এরপর ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি নাজিমউদ্দিন ঢাকা এসে পল্টন ময়দান (বর্তমানে আউটার স্টেডিয়াম) অনুষ্ঠিত জনসভায় জিন্নাহ্র মতন একই বক্তব্য দিয়ে পূর্ববাংলার দাবি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার বিরোধিতা করতে কুণ্ঠিত হলেন না। অথচ যখন তিনি পুরস্কৃত হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন, তিনি তখন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি কেন্দ্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সুপারিশ ও চেষ্টা করবেন। সে প্রতিশ্রুতি বেমালুম গিলে খেয়ে পূর্ববাংলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। আর ক্ষমতার দম্ভ আর লিপ্সা তাঁকে এমনভাবেই গ্রাস করেছিল যে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে বাংলার তরুণ ছাত্রসমাজ কি করতে পারে!

খাজা নাজিমউদ্দিন কেন্দ্রে চলে যাবার পর পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন নুরুল আমিন। নাজিমউদ্দিনের মুখে জিন্নাহ্র বুলির পুনরুক্তি শুনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ সংগঠিত হলেন প্রতিবাদে। নানা কার্যক্রমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন এবং ক্রমশ এ আন্দোলনকে বিস্তৃত করার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে থাকলেন। নব্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈমাত্রেয় আচরণের হিংসাত্মক বহিঃপ্রকাশ ও বঞ্চনার কপটতা ধরা পড়ে গেল ডাক বিভাগের পোস্টকার্ড, মানি অর্ডার ফরমের নির্দেশসমূহ বাংলাবর্জিত এবং উর্দু ও ইংরেজিতে ছাপা হওয়ায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষার সরকারি পদক্ষেপ

বাংলার সচেতন মানুষকে রীতিমত ক্রুদ্ধ করেছিল। তারই প্রেক্ষাপটে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বক্তব্য প্রত্যাখ্যান, প্রতিবাদ এবং অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা করার সংগ্রামের পত্তন। শুধু তাই নয়, দাবিও উঠেছিল বাংলাকে সর্বস্তরে চালুও করতে হবে। 'উজিরে আজম' নাজিমুদ্দিন বায়ান্নতে সেই দাবির ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী চৈতন্যকে আঘাত করলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সক্রিয় ও সরব হলো। ক্রমশ তরুণ ছাত্রসমাজ নিজেদের সংগঠিত করলেন এবং তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ লীগবিরোধী দলের সাথে যোগাযোগ করলেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে প্রধান ও কাজী গোলাম মাহবুবকে সম্পাদক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসমাজ পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সম্মিলিত হয়ে 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের ছাত্র আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হলো।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র বক্তব্যের প্রতিবাদে এবং সরকারি আচরণের প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সর্বদলীয় কমিটি গঠিত ও প্রথম বৈঠকের পর মাওলানা ভাসানী সন্তোষে চলে যাওয়ায় আবুল হাসেম প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা ও জিন্নাহ্‌র বক্তব্যকেই পুনরুক্তি করে তিনি যে বক্তৃতা করলেন, তার প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। তাতে তাঁরা এ সংগ্রামকে বেগবান করতে আরো সংঘবদ্ধ হতে থাকলেন। স্কুল-কলেজে যোগাযোগ বাড়াতে থাকলেন এবং রাজনৈতিক দলের ঐ সর্বদলীয় কমিটির সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলছিলেন। সাধারণ ছাত্রদের সংগঠিত করার তৎপরতা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদ (বর্তমানে জগন্নাথ হলের অংশ) অভিমুখে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকার ঢাকা শহর ও শহরতলিতে ১৪৪ ধারা জারি করে অনির্দিষ্টকালের জন্য। ছাত্রদের আন্দোলনকে দমনের উদ্দেশ্য নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত ও নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও ছাত্রসমাজ দৃঢ়সংকল্প ছিল সংগ্রামে। তাঁরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু বাদ সাধলো রাজনৈতিক দল ভিত্তিক সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। বৈঠক ডাকলেন এবং আলোচনায় প্রতিভাত হলো তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে নন, কিন্তু ছাত্র প্রতিনিধিরা অনড়। তারা জানালেন, তারা অবিচল তাদের সিদ্ধান্তে। সভা দ্বিমত পোষণ করে। আবুল হাসেম সভাপতিত্ব করছিলেন, তিনিও ছাত্রদের এ সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করতে পারলেন না। বাস্তব কারণে রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা ছিল, এমন সময়ে এ ধরনের চরম সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী হবে। তাই সর্বদলীয় কমিটির আহ্বায়ক কাজী গোলাম মাহবুব তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললেন, এই সভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়ে ছাত্ররা যদি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, তাহলে ঐ মুহূর্ত থেকেই 'সর্বদলীয় কমিটি' বাতিল হয়ে যাবে। ছাত্র প্রতিনিধিরা ফিরে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে অপেক্ষমান হাজার হাজার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর ক্যান্টিনের সামনে আমতলায় সমবেত ছাত্রসভায় সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো ১৪৪ ধারা ভেঙ্গেই প্রতিবাদী মিছিল বের করতে হবে। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন ছাত্রনেতা গাজীউল হক এবং পরিস্থিতি পূর্বাপর বিশ্লেষণ করে আবদুল মতিন তুলে ধরলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক। সভার প্রারম্ভে সর্বদলীয় কমিটির সদস্য এবং তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক মওলানা শামসুল হক ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে বক্তব্য দেওয়ায় সমবেত শিক্ষার্থীরা সরবে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যা হোক, আহ্বায়ক আবদুল মতিনের বক্তৃতার পর সমস্বরে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে মত দেন এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় দশজনি মিছিল বের হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সংগ্রামী ছাত্রসমাজ। প্রথমে বেরিয়েছিল ছাত্রীদের দশজন। পুলিশ গ্রেফতার করে তাঁদের গাড়িতে তুলে শহর থেকে দূরে ছেড়ে দিয়েছিল। এমনি করে ছাত্রদের মিছিল বের করতে থাকে, যখন একটার পর একটা দশজনি মিছিল অনবরত বেরুতে থাকলো তখন পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হলো। মনে হয়েছিল তাই, কিন্তু পুলিশের মতলব ছিল প্রচণ্ড হিংস্র। তারা এ মিছিল যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্র হোস্টেলের সামনে আসলো তখন লীগ সরকারের পেটোয়া পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ছাত্রদের উপর এবং গুলি করে হত্যা করল ছাত্রদের। ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার। তরুণ তাজা প্রাণের বুকের রক্ত দিয়ে ফিনকি পৌঁছলো সারা বাংলায়। গুলিতে,

হত্যায়, নিপীড়নে স্তব্ধ করা গেল না রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। ২১, ২২, ২৩, ২৪ এমনি করে এগিয়ে গেল প্রতিরোধের লড়াই। দুটো লক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরতে চেষ্টা করছি। এক. নিহত হচ্ছেন পথচারী দোকানকর্মী, সাধারণ মানুষও। কিন্তু লাশ গুম করে ফেলছে পাকিস্তানি মিলিটারি। তাই আজও আমরা জানি না বাস্তবে কতজন শহীদ হয়েছিলেন ভাষা সংগ্রামে। দুই. মুসলিম লীগের অন্ধসমর্থক ঢাকার আদিবাসিন্দা যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুসলিম লীগের পেটোয়া, তারা ছুটে এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের সমর্থন জানাতে। তিন. পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে খুনি মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাতে যদিও সফল হননি তা সত্ত্বেও মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ বা খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন পরিষদ থেকে বেরিয়ে আসেন। আবুল কালাম শামসুদ্দিন তখন *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সম্পাদক এবং ব্যবস্থাপক পরিষদ সদস্যও। তিনি পদত্যাগ করেন সদস্য পদ থেকে। এখানে উল্লেখ্য, দৈনিক আজাদ ছিল মাওলানা আকরাম খাঁ-র পত্রিকা এবং তিনি মুসলিম লীগের নেতা, তাই তাঁর ও পত্রিকার ভূমিকা ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে। চার. উর্দু ভাষাভাষী সম্প্রদায় এই দাবির বিরুদ্ধে কিন্তু এঁদের মধ্যে প্রগতিশীল কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চলচ্চিত্রকার ও শিক্ষাবিদ অনেকেই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ছিলেন, এমনকি এ জন্য গ্রেফতার হয়েছেন ও নিপীড়ন সহ্য করেছেন। পাঁচ. পূর্ববাংলায় বসবাসকারী আদিবাসী-পাহাড়ি ও সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সদস্যরা পূর্ববাংলার যেকোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন তেমনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেও তাঁরা শরিক হয়েছেন, জেল জুলুম সহ্য করেছেন।

পূর্ববঙ্গে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্-র দম্ভোক্তির প্রতিবাদে, সেই ভাষা সংগ্রামের দাবি ছিল: ১) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে; ২) সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করতে হবে এবং ৩) সকল আঞ্চলিক ভাষার সমান মর্যাদা দিতে হবে। এর মধ্যে পাকিস্তান ১৯৫৬ সালে দেশের যে শাসনতন্ত্র পাস করেছিল, তাতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি। তারপর ১৯৫৮ সালে দেশময় সামরিক শাসন জারি হলে 'শাসনতন্ত্র'ই বাতিল করে দেওয়া হয়। ফলে বাংলার দাবি আর কখনোই গ্রাহ্য হয়নি। অবশেষে বাংলার সাধারণ মানুষকে সংগঠিত হতে হয়েছিল মুক্তির লক্ষ্যে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে–সকলে দলমত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রাণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন উনিশশো একাত্তরে। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে লক্ষ্যস্থির করে ভাষা সংগ্রামেরই আরেক সংগঠক, সে সময়ে বঙ্গবন্ধুর সার্বক্ষণিক সাথী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে ন'মাস মরণপণ লড়াইয়ে এই বাংলায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাভূত করে মুক্ত স্বাধীন হয়েছিল।

আমরা পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করেছি রক্তের স্রোতধারায় কিন্তু দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণ-শাসনের ফেলে রেখে যাওয়া নিয়ম-কানুন ও রাজনৈতিক চরিত্রকে প্রত্যাখ্যান করে মুক্তির নতুন পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলাম। সংস্কৃতির বিপুল ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও স্বকীয় ধারা সৃষ্টিতে যেমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারলাম না, তেমনি রাজনীতির সে প্রাসাদ চক্রান্তকে পরাভূত করলাম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে, তার প্রেতাত্মা যেন আমাদের গ্রাস করে ফেললো বাংলাদেশের অভ্যুদয়বিরোধী পরাশক্তি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অদৃশ্য হস্তক্ষেপে। তবে বাংলার স্বাধীনতার ঘোষক ও জনগণের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে বিশ্বজনমত এবং মুক্তিযোদ্ধা-বাংলার অকুতোভয় মানুষের দাবিতে মুক্ত হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন। দেশ একটি অসাম্প্রদায়িক সংবিধান পেল ১৯৭২ সালে। এবার বাংলাভাষা কিন্তু কেবলমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেল। সর্বস্তরে চালু করার প্রচেষ্টা শুরু হলো। সরকারি পর্যায়ে বাংলাভাষা চালুর নির্দেশ জারি হলো বটে, তবে কাজেকর্মে খুব একটা ব্যবহার করা হলো না । ইংরেজির প্রভাব থেকেই গেল। এমনকি অফিসে দপ্তরে যে কোন বিষয়ে 'মন্তব্য' লিখতে গেলে আমলারা বিদেশি ভাষাতেই লিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে থাকলেন। এটি মাতৃভাষার প্রতি প্রেমের অভাবে নয়, বদভ্যাসের কারণে। শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ ইংরেজিতেই নির্দেশ, পরামর্শ, মন্তব্য লেখা অব্যাহত রাখলেন। ফলে প্রচেষ্টা উপর পর্যায়ে হলেও নিচে তার কোন ফল হলো না। অনেক পরে সরকারি কাজে ব্যবহৃত

শব্দাবলির বাংলা শব্দ অভিধান আকারে প্রণীত হলো, সে ভাষা আজো সহজ বোধগম্য নয়। কিম্ভূতকিমাকার শব্দের উদ্ভাবনায় সরকারি বিধি, নির্দেশ, মন্তব্য সহজে বোধগম্য হলো না হচ্ছে না। তবে সরকারি কর্মচারীরা নামতা মুখস্থ করার মতন নতুন দাপ্তরিক শব্দাবলি শিখতে থাকলো। আমলারা বেশির ভাগই ঐ ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। সাধারণের বোঝা দুস্কর হয়ে যায়। দুর্বোধ্য বাংলা ব্যবহার করলেও সেটাই চালু হয়ে গেছে। তবে রাষ্ট্রীয় জীবনের অন্যান্য অংশে তা সম্ভব হয়নি। আদালতে বাংলা চালুর জন্য ভাষাসংগ্রামী নেতা গাজীউল হক চেষ্টার কমতি করেননি। লেখা হচ্ছে অনবরত। এই প্রবণতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঠেকানো সম্ভব কেন হচ্ছে না? কোন দেশের উচ্চ আদালত অন্যান্য বিষয়ে যখন করণীয় নির্ধারণ করে দিচ্ছেন, এক্ষেত্রে জাতিসত্তার পরিচয় বহনকারী ব্যবহারিক ভাষা 'বাংলা' জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রচলনের নির্দেশ দিচ্ছেন না? ইংরেজি বা অন্য কোন ভাষা জানতে শিখতে পড়তে কোন অনীহাতো নেই-ই। আমরা বরঞ্চ উৎসুক যে কোন ভাষা শিখতে। এসব ক্ষেত্রে যারা আরবি শেখেন আজকাল মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরির উদ্দেশ্য নিয়ে। তাতে কারো আপত্তি নেই, বরঞ্চ যে কোন দেশে গেলে, সে পড়াশোনা হলে তো প্রথম ঐ দেশি ভাষা শিখতে হয় তারপর পড়া শুরু হয়। সে তো জানি। এতে তো কেউ আপত্তি করছেন না। যত ভাষা পারেন শিখুন, কিন্তু মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে যেন না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এ যে আমার আদত পরিচয়। এই তো মাতৃভাষা।

সমাজের প্রতিপত্তিশালী মানুষ, বিত্তবান জনগোষ্ঠী, রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত চাকরিজীবী উপরওয়ালারা কেন ভাবছেন নিজেদের যেভাবে পরের দাসত্ব করে চলে গেলেন পরবর্তী প্রজন্মও তেমনিভাবে চলবে! তারা তো ঐতিহ্যের সংগ্রাম সম্পর্কে জানতে পারছেন, শুনতে পারছেন এদেশ সৃষ্টিই হয়েছে বাংলার মানুষের মুক্তির বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণিকে পরাজিত করে। তবে তাদের কেন পুরোনো সেই অনাকাঙ্ক্ষিত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে উৎসাহী করে তোলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে? এখন জনসংখ্যা বেড়েছে। বিদেশে পড়তে যাবার প্রবণতা যেমন বেড়েছে তেমনি বিদেশে চাকরি করে অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্ষা ও ভিন্ন ভাষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে সহায়তা করছে। এমনিভাবে যদি পরভাষা প্রীতি ক্রমশ বাড়তে থাকে তবে তো নিজস্ব ভাষা- মাতৃভাষার ব্যবহার ও কদর তুলনামূলকভাবে কমে যাবে। আমরা তো ভিনদেশি ভাষার প্রতি বৈরী নই, তবে অকারণে অন্যভাষা চর্চাকে উৎসাহিত করতে চাই না। যেখানে মাতৃভাষা বাংলা দিয়ে চলতে পারে, চালানো যায় সেখানে কেন অন্য ভাষা অকারণে ব্যবহার করা হবে?

সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি

ভিনদেশি ভাষা শিখতে কেউ তো আপত্তি করেনি। অথচ বাংলাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বিদেশি ভাষাপ্রীতি এতই বেড়ে গেছে যে, তার জন্য নতুন শব্দচয়ন পর্যন্ত করা হচ্ছে। ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে এক অদ্ভুত 'বচনরীতি' তৈরি করে ফেলেছেন কিছু অভিজাত কিংবা উচ্চবিত্তের মানুষ এবং তাদের সন্তানাদি ও একই পদ্ধতিতে বিকৃত বাংলা উচ্চারণ এবং ব্যবহারেও অপশ্রুত বাক্য প্রয়োগ করে সমাজে প্রতিপত্তি খাটিয়ে চলেছেন। কেউ এর প্রতিবাদ করছি না, অথবা করতে সাহস পাচ্ছি না কিংবা ক্ষুব্ধ হয়ে নিজের মধ্যেই গুমরে মরছি। কেন এই দুরবস্থা? আমরা তো ভাষা সংগ্রাম থেকেই জন্মেছি। আমরা তো বীভৎস সামরিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে লড়েছি এবং চূড়ান্ত যুদ্ধে মুক্তি পর্যন্ত অর্জন করেছি। তবে কেন নিজ মাতৃভাষাকে অনীহা প্রদর্শন, বিকৃত-ভেজাল উপসর্গ দিয়ে অগ্রহণযোগ্য করে তোলা হচ্ছে? কেন বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আজও এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছেন না। কেন শিক্ষক-পণ্ডিতজনেরা বলছেন না, এ ভাষা আমার নয়। এর অগ্রহণযোগ্য কথ্য পদ্ধতি গ্রহণ করতে রাজি নই । কেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বুক ঠুকে আমরাও বলছি না একে আমরা গ্রহণ করবো না। আমার মাতৃভাষাকে যারা বিকৃত করে, ভেজাল মেশায়; তারাই আমাদের নয়। কেন ইচ্ছে করে না বলতে, দ্বাদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম যা বলতে সাহস করেছিলেন এবং সাহসের সাথে লিখে গিয়েছিলেনা :

"যে সবে বঙ্গে ত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন' জানি।"

আজকের এত বিদ্বান, বুদ্ধিদীপ্ত, কীর্তিমান আমরা কিংবা আমাদের মতন সচেতন মানুষেরাও পিছিয়ে থাকি, এই ধরনের গুরুতর অপমান-অপবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে? তবে কি কবির উদ্ধৃত লেখার দ্বিতীয় পংক্তির মতন জীবের

আচরণই করছি না? হায় রে দুর্ভাগা দেশ, যে ভাষার জন্য এতগুলো মানুষ জীবন বলিদান করতে দ্বিধা করলেন না, ''তাদেরই উত্তরসূরি আমরা নিজ পূর্ব পুরুষদেরকে অপমানিত করার মতন ধৃষ্টতা দেখাতে 'সাহস' দেখাচ্ছি অথচ প্রতিবাদের প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। তাই তো আজ কেবল ভাষা বিকৃতিই ঘটছে না, ব্যবহারিক জীবনে ভিনদেশিয় ভাষার ব্যবহার বেড়ে চলেছে। একত্রিত হয়ে কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠছে না।

ক্ষুদ্র জাতি সত্তার ভাষা

এই আমরাই রাষ্ট্র, সরকার, সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসী বিশেষ করে বিদেশি ভাষা ব্যবহারে কার্পণ্য করছি না, তারা কিন্তু নিজ দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা কোনটিকেও গ্রাহ্য করছি না তো বটেই, এমনকি রাষ্টভাষা আন্দোলনে যারা 'সকল আঞ্চলিক ভাষার সমান মর্যাদা' চেয়েছিলাম, তারাও দেশের আঞ্চলিক বা জাতিসত্তার নিজস্ব ভাষাকে স্বীকৃতি দিচ্ছি না। অথচ আমরাই বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে দাবি করেছিলাম। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কেউ তো নিজের ভাষাকে 'রাষ্ট্রভাষা' দাবি করছে না। ক্ষুদ্র এই জনগোষ্ঠীর, যাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে তাদের স্বীকৃতি এবং প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ চেয়েছিল তাও দিতে এতকাল কার্পণ্য করেই গেছি। বর্তমান মহাজোট সরকার যাদের নিজস্ব ভাষা এবং বর্ণমালা আছে, তাদের লেখাপড়া করার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। চার দশক উপেক্ষা-অবহেলার বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দেওয়ায় আমরাও কৃতজ্ঞ। ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষও সন্তুষ্টি পেয়েছেন। তারা এই দাবি করে আসছিলেন দীর্ঘকাল থেকে। তাদের দাবি ছিল প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত নিজ মাতৃভাষায় পড়াশোনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা তা থেকে উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে তারা বাংলা ও ইংরেজিতেই পড়তে চান। এই সরকার প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়তে দেওয়ায় ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠীর জনগণও আনন্দিত ও খুশি হয়েছেন। আমরাও, ভাষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে যারা সচেতন ও প্রগতি ভাবনা করি, তারাও আনন্দিত। সত্যিকথা বলতে কি, বাংলা ভাষার চাপে ওঁদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল । এই সিদ্ধান্তে অন্তত যেটুকু আছে সেটা তো রক্ষা পাবে। এজন্য আমরাও যারা ভাষা সংগ্রামী তারাও কৃতজ্ঞ মহাজোট সরকার বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে।

এখানে একটি মহতী উদ্যোগের উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে আমার ধারণা, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার স্থানীয় আদিবাসী ভাষা কক্‌বরক-কে শুধু স্বীকৃতি দেয়নি, এই ভাষা এখন বাংলা ও হিন্দির পাশাপাশি চর্চাও করা হচ্ছে। কক্‌বরক সীমিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা হলেও আজ প্রধান ভাষাগুলোর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে এবং এই ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টি ও চর্চা করা হচ্ছে। কক্‌বরক ভাষায় কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক রচিত হচ্ছে। কক্‌বরক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী আমাদের দেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে বড়ো, এটার সুবিধায় সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। এমনকি বাংলা ভাষা-ভাষী কবি-সাহিত্যিকরাও কক্‌বরক ভাষায় লেখালেখি করছেন।

আমাদের দেশে যেসব ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষা রয়েছে, তা কেবল নিজস্ব গণ্ডিতেই চর্চা হবে কারণ তার বিস্তৃতি ঘটার মতন তেমন কোন সুযোগ নেই, কক্‌বরকের মতন। এছাড়া এইসব জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা এতই কম যে, এর প্রচলন কেবল নিজেদের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। সুতরাং বাংলা ভাষাভাষীর জনগোষ্ঠীর উদারতাই হবে এই সিদ্ধান্ত। ভয় পাবার কিছু নেই।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি, তা হলো, ভারতের অসম রাজ্যেও বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর অংশ বড়ো। তাই ১৯৮৬ সালের ১৯শে মে সেখানকার জনগোষ্ঠীর যাঁরা বাংলায় কথা বলেন তাঁরা বাংলা ভাষাকে রাজ্য সরকারের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে চূড়ান্ত আন্দোলনে এদিন ১১ জন প্রাণ দেন। এঁদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন, নাম তাঁর কমলা ভট্টাচার্য। অহমিয়া ভাষার পাশাপাশি বাংলাকেও স্থান দেওয়ার সংগ্রাম শিলচর এবং করিমগঞ্জে শুরু হয়। পরে করিমগঞ্জেও একজন প্রাণ বিসর্জন দেন। বাংলাভাষাকে রাজ্য সরকার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিলচর শহরের গান্ধি পার্কে এই ভাষা শহীদদের জন্য অসাধারণ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন। মহান ভাষা সংগ্রামের সাক্ষ্যবহন করছে এই স্মৃতিসৌধ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বিদেশে অবস্থানরত আবদুস সালাম ও রফিকুল ইসলাম নামের দুই বঙ্গসন্তান এক মহতী চিন্তা নিয়ে বাংলাকে অন্যতম

রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জনের দিন একুশে ফেব্রুয়ারিকে যথার্থ সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চিন্তা ভাবনা করলেন ১৯৯৮ সালে। ওঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করে ইউনেস্কোর কাছে গেলেন। কিন্তু তখন জানতে পারলেন, কোন ব্যক্তি চাইলেই বিশ্ব সংস্থায় এমন প্রস্তাব করতে পারেন না, পারলেও তা গ্রাহ্য হবার নয়। এই আবেদন কোন না কোন রাষ্ট্রকে করতে হবে। তখন তাঁরা দুজন কানাডা থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং বাংলাদেশের তৎকালীন সরকারকে বিষয়টি জানান এবং এই মর্মে আবেদন উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

দেশে তখন আওয়ামী লীগ সরকার। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সাথে দেখা করে বিষয়টি জানালেন। কারণ সরকারি উদ্যোগ না হলে তো এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। শেখ হাসিনা সরকার ১৯৯৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনেস্কোর কাছে আবেদন জানান এবং প্রাসঙ্গিক করণীয় সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বিষয়টিকে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করেন। বিশ্বের কোন দেশে মাতৃভাষা রক্ষার জন্য এমন প্রাণ বলিদানের ঘটনা আজও ঘটেনি। এটিই সেই সংগ্রাম সংক্ষুব্ধ নৃশংস ঘটনার দিন। বহু লড়াই-সংগ্রামের পর অবশেষে ইউনেস্কো পূর্ববাংলার অর্থাৎ বাংলাদেশের মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষার আন্দোলনে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার-সহ বহুজনের প্রাণ হরণের দিনটিকে *আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস* হিসেবে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ঘোষণা করেছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পৃথিবীর দেড় শতাধিক দেশে প্রতিপালিত হচ্ছে। ধ্বনিত হচ্ছে হয়তো 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানে আলতাফ মাহমুদ আরোপিত অজেয় সুর। মাতৃভাষার গর্বে কত না দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে। আর আমরা শহীদদের মহান আত্মদানকে স্মরণ করি। শপথ নেই লেখায়, কথায়, বক্তৃতায়, কবিতা-গানে-নাটকে-সাহিত্যে বাংলা সর্বস্তরে চালু করার। কিন্তু চালু হয় না। কেন হয় না, তাই খুঁজে বের করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আমরা স্বকীয়তাই বিসর্জন দিয়েছি অনেকাংশে, তাই আজও শহীদের রক্তঋণ শোধ করতে পারিনি।

জাতিসংঘের মৌলভাষা : বাংলা হবে কি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলা ভাষায় তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। এ ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। জাতিসংঘে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে বাংলা ছিল না, আজও নেই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলা ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় বক্তৃতা দেবেন না, তখন জাতিসংঘ ব্যবহৃত মৌলভাষা বাংলা না হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁকে বাংলায় বক্তৃতা করতে দেওয়া হয়। ১৬ কোটি মানুষের প্রধান ভাষা বাংলা। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা বাংলা–এই বাংলাকে রক্ষার জন্য প্রাণোৎসর্গকারী জনগোষ্ঠীর রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারি' যখন জাতিসংঘাধীন বিশ্বসংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ভাষাকে জাতিসংঘের মৌল ব্যবহারিক ভাষার তালিকাভুক্ত করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আবেদন জানান। ২০১০ সালের ২১শে অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তার পর থেকে সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আজও তা কার্যবিবরণীর ভাষাতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আমরা বিশ্বাস করি, খুব শিগ্‌গিরই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বাংলাকেও ব্যবহারিক ভাষার তালিকাভুক্ত করবে। অমর একুশে জিন্দাবাদ। শহীদ স্মৃতি অমর রহে।

ভাষা আন্দোলন থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস : নারীর প্রজ্ঞা

সেলিনা হোসেন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে জেলে অবস্থানকালে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'আমাদের এক জায়গায় রাখা হয়েছিল জেলের ভিতর। যে ওয়ার্ডে আমাদের রাখা হয়েছিল, তার নাম চার নম্বর ওয়ার্ড। তিনতলা দালান। দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় স্কুলের মেয়েরা ছাদে উঠে স্লোগান দিতে শুরু করতো, আর চারটায় শেষ করতো। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটুও ক্লান্ত হতো না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দী ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না' নানা ধরনের স্লোগান। এই সময়ে শামসুল হক সাহেবকে আমি বললাম, "হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।" হক সাহেব আমাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব।"

বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাষা আন্দোলনে নারীর অবদানকে মূল্যায়ন করেছিলেন। নারীর ভূমিকাকে তিনি মূল্যায়ন করেছিলেন দ্বিধাহীনভাবে - স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে এবং বড়ো পরিসরে। লক্ষ্য অর্জনে নারী-পুরুষের সমতার জায়গা থেকে। অথচ আজ পর্যন্ত এটি একটি অবধারিত সত্য যে, ইতিহাসের মূলধারায় নারীর অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃত হয় না। ইতিহাসবিদরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর অবদানকে পাশ কাটিয়ে যান কিংবা খানিকটুকু স্বীকার করলেও স্বীকারের মাত্রা বিস্তৃত বিশ্লেষণ পায় না। ফলে নামমাত্র উল্লেখে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসকে একরৈখিক করে রাখে। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসও নারীকে প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেনি। অথচ এই আন্দোলনে নারীর ভূমিকা গৃহিণী থেকে শুরু করে গণপরিষদের সদস্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারী তার ভূমিকাকে সক্রিয় রেখেছে।

ইতিহাস এভাবেই এগোয়। ইতিহাস এভাবে নারী-পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টায় অর্জন করে গৌরব। নারীকে বাদ রেখে ইতিহাসের কোনো বড়ো অর্জন কখনোই সম্ভব হয়নি। বরং বড়ো অর্জনের দুর্ভোগের দায়ভাগও নারীকে প্রবলভাবে সইতে হয়।

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হওয়া নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান একটি রক্ষণশীল রাষ্ট্র কাঠামোর অধীনে নারীর সর্বত্র অভিগম্যতা সহজ বিষয় ছিল না। তারপরও ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সূচিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নারী ধর্মের ধুয়া তুলে নিষ্ক্রিয় থাকেনি। সভায়-মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে। এমনকি স্কুলের ছাত্রীরাও মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ওপর দায়িত্ব পড়েছিল আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার। তাঁরা কাজটি করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সচেতনতা বোধ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী রওশন আরা বাচ্চু তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, 'আমরা সেই সময়ে ঘরে ঘরে গিয়েছি। বেশির ভাগ নারী তো চাকরিজীবী ছিলেন না। তারা তাদের একটি গয়না দিয়েছেন, কিংবা যিনি পেরেছেন তিনি টাকা দিয়েছেন। আমরা তাদের মাতৃভাষার মর্যাদার কথা বোঝাতাম। আমাদের আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা কেন জরুরি সে কথা বলতাম। এভাবে আমরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানের পক্ষে সচেতনতা গড়ে তুলেছিলাম। মানুষ যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, এটিও ছিল তার অন্যতম কারণ। তিনি আরও বলেছেন, 'পরিবারের বাধার কারণে মেয়েরা অনেক সময় বোরকা পরে মিছিলে আসত।

একবার বাংলাবাজার স্কুলের এক ছাত্রীকে মা মিছিলে আসতে দেবে না বলে চুল কেটে দিয়েছিল। মেয়েটি মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে মিছিলে এসেছিল। এভাবে মেয়েরা সাধ্যমতো সহযোগিতা করেছে। রওশন আরা বাচ্চুর স্মৃতিচারণায় দুটি বড়ো জিনিস উঠে আসে। একটি নারীদের গায়ের গয়না খুলে দেওয়ার বিষয়। অন্যটি পরিবারের বাধা উপেক্ষা করে মিছিলে অংশগ্রহণ। নারীরা প্রথমটায় নেপথ্য কর্মী, অর্থ দিয়ে আন্দোলন পরিচালনার কাজটি করেছে। আন্দোলনের ধারাটি বেগবান রাখার জন্য সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। দ্বিতীয়টি ছিল সরাসরি অংশগ্রহণ। ছেলেদের ক্ষেত্রে পারিবারিক বাধা কম থাকে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার কাজটি ছেলেদের জন্য বড়ো ধরনের প্রতিবন্ধকতা নয়। তারপরও মেয়েদের অবস্থান ছিল ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ, মেয়েদের বেড়ি ভেঙে এগোতে হয়েছিল। এই কঠিন কাজটি মেয়েরা করেছিল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিবেচনা থেকে। অস্তিত্বের সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রবল তাড়নায়। ইতিহাস এভাবেই এগোয়। ইতিহাস এভাবে নারী-পুরুষের সম্মিলিত চেষ্টায় অর্জন করে গৌরব। নারীকে বাদ রেখে ইতিহাসের কোনো বড়ো অর্জন কখনোই সম্ভব হয়নি। বরং বড়ো অর্জনের দুর্ভোগের দায়ভাগও নারীকে প্রবলভাবে সইতে হয়।

দেশ ভাগের পরে পার হয়ে যায় সাড়ে চার বছর। বিভিন্ন সময়ে ভাষার দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে ছাত্রসমাজ। শাসক গোষ্ঠীর হুঙ্কার ছিল, উর্দু, উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ছাত্ররা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে ফেটে পড়েছিল। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকার লাইব্রেরি হলে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। পরিষদ ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সভা, হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। একুশে ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় ছিল গণপরিষদের অধিবেশন। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য স্মারকলিপি প্রদানের উদ্দেশ্যে গণপরিষদের দিকে মিছিল নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচিও ছিল। ছাত্রসমাজের এমন কর্মসূচিতে বিচলিত বোধ করে সরকার। তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নূরুল আমীন। তার সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে আন্দোলন দমন

২১ তারিখ সকাল থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় জমায়েত হয়। কারণ, ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ড. সুফিয়া আহমদ স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন, 'তাঁর ওপর দায়িত্ব পড়েছিল আনন্দময়ী ও বাঙলাবাজার স্কুলের মেয়েদের জড়ো করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় নিয়ে আসার। তিনি কাজটি করেছিলেন। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ছেলেরা দশজন করে এবং মেয়েরা চারজন করে বের হয়ে পুলিশের ব্যারিকেড পার হয়ে এগিয়ে যাবে।' তিনি আরও বলেন, প্রথমে ছাত্রদের দুটি দল মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে ট্রাকে তোলে। তৃতীয় দল নিয়ে বের হয় মেয়েরা। কিছুদূর যাওয়ার পর শুরু হয় পুলিশের লাঠিচার্জ। টিয়ার গ্যাস ছোঁড়া হয়। তিনি সামান্য আহত হয়েছিলেন। তারপরও গণপরিষদ ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। একদিকে ছিল পুলিশের হামলা, অন্যদিকে ছাত্ররা পুলিশের ওপর ইট-পাটকেলের টুকরো ছুঁড়ছিল। তিনি বলেন, তাঁর মনে হয়েছিল তারা বুঝি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন। পরমুহূর্তে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। শহীদ হন শান্তিপূর্ণ মিছিলে অংশগ্রহণকারী সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেকে। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিলেন। সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত হলে তিনি বাড়ি ফেরেন।

ড. সুফিয়া আহমেদের স্মৃতিচারণায় স্পষ্টই বোঝা যায়, নারী হিসেবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তারা ভীত ছিলেন না। টিয়ার গ্যাস, লাঠিচার্জ ও গুলি মাথায় নিয়ে আন্দোলনকে সফল করার জন্য তাঁরা ছিলেন অবিচল। এই অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে নারী ইতিহাসের প্রথম সারির মানুষ।

ড. হালিমা খাতুন ছিলেন ভাষা আন্দোলনের অংশগ্রহণকারীদেরই একজন। তিনি স্মৃতিচারণায় বলেন, ১৪৪ ধারা ভাঙা নিয়ে তুমুল উত্তেজনা ছিল তাঁদের। তাঁর ওপর দায়িত্ব ছিল মুসলিম গার্লস স্কুল এবং বাংলাবাজার গার্লস স্কুল থেকে মেয়েদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় আসা। ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর দল ছিল মেয়েদের প্রথম দল। পুলিশ পথ আটকালে তারা পুলিশের রাইফেল ঠেলে স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যান। পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ে। তাঁরা বিন্দুমাত্র দমে

না গিয়ে ঢাকা মেডিকেলের ইমার্জেন্সি থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আবার রাস্তায় নেমে আসেন এবং গণপরিষদ ভবনের দিকে এগোতে থাকেন। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেননি তাঁরা। শুরু হয় পুলিশের গুলিবর্ষণ। গুলিতে রফিকের মাথার খুলি উড়ে যায়। সেই রাতে রফিকের ছবির একটি ব্লক তৈরি করা হয়। ব্লকটি রাখা হয় সলিমুল্লাহ হলে। তাঁদের বন্ধু সাবেক অর্থমন্ত্রী প্রয়াত শাহ কিবরিয়ার রুমে। পুলিশ হল তল্লাশি শুরু করলে সবাই সেখান থেকে সরে পড়েন। হল পুলিশের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এ অবস্থায় রফিকের ছবির ব্লকটি নিয়ে আসার জন্য তাঁকে হলে পাঠানো হয়। তিনি বলেন, ভীষণ ঝুঁকির মুখে জীবন হাতে নিয়ে ব্লকটি উদ্ধার করেছিলাম। এখন পর্যন্ত রফিকের যে ছবিটি দেখা যায়, সেটি ওই ব্লক থেকে তৈরি। শহীদ রফিকের ছবি আজকে ইতিহাসের দলিল। এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি ধরে রেখেছিলেন একজন নারী।

রওশন আরা বাচ্চু সেদিনের স্মৃতিচারণায় বলেছেন, তিনি দেখতে পান, ছাত্রদের দুটো দল পুলিশের ব্যারিকেড টপকে চলে যায়। এর পরই তিনি অন্যদের নিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তাকে সামনে পেয়ে পুলিশের লাঠিচার্জের আঘাত এসে পড়ে তার ওপরে। তিনি পুলিশের এলোপাতাড়ি লাঠিপেটায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। গুলিবর্ষণ শুরু হলে রাস্তার পাশের একটি পুরোনো রিকশার গ্যারেজে লুকিয়ে থাকেন। অনেকক্ষণ সেখানে থেকে সন্ধ্যায় ছাত্রী হোস্টেলে ফিরে যান।

মিছিলে গুলিবর্ষণের সময় গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। অধিবেশন চলাকালেই গুলিবর্ষণের খবর পৌঁছায় সেখানে। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রথম দাবি উত্থাপন করেন এই বলে, আগে গুলিবর্ষণের তদন্ত হোক, তারপর অধিবেশন চলবে। গণপরিষদ সদস্য আনোয়ারা খাতুন জোরালো ভাষায় বক্তব্য রাখেন। স্পিকার আবদুল করিমের সঙ্গে তীব্র ভাষায় তর্কবিতর্কের পর আনোয়ারা খাতুনসহ ৩৫ জন সদস্য পরিষদ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন। গণপরিষদ অধিবেশনেও নারীর পিছিয়ে থাকার অবমাননাকর ঘটনা সেদিন ঘটেনি।

একুশের প্রথম শহীদ ছিলেন রফিকউদ্দীন। তার মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল। ঘটনার পরপরই এই ঐতিহাসিক দৃশ্যের ছবি তোলেন আমানুল হক, কাজী ইদ্রিস, মেডিকেল ছাত্রী হালিমা খাতুনের সহযোগিতায়। সেদিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের সেবা দিতে গিয়ে ক্রোধে ফেটে পড়েছিলেন হাসপাতালের সেবিকা মেয়েরা। প্রতিরোধের জায়গাটি এভাবে তাদের সহযোগিতা, সমর্থনে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকাসহ সারাদেশে হরতাল, মিছিল, বিক্ষোভ পালিত হয়। যেসব নারী মিছিলে অংশ নিতে পারেননি তারা বাড়ির ছাদ থেকে ফুল ছিটিয়েছেন মিছিলের ওপর। এটিকে খুব স্বল্প পরিসরের আয়োজন বলে ভাবার কোনো কারণ নেই। অনুপ্রেরণা প্রদানকারী ঘটনা হিসেবে মিছিলের ওপর পুষ্পবৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নারীরাই গ্রহণ করেছিলেন। স্মৃতিচারণায় অনেকে বলেন, রাতভর পোস্টার লিখেছেন নুরুন্নাহার কবিরসহ অনেক মেয়ে। ইতিহাসে তাদের নাম চাপা পড়ে গেছে। একজন নারীর কালো রঙের শাড়ি কেটে ব্যাজ বানানো হয়েছিল। তাকেও মনে রাখেনি কেউ। নারীরা নামের অপেক্ষায় কেউই ছিলেন না। তারা চেয়েছিলেন আন্দোলনের সাফল্য। চেয়েছিলেন মাতৃভাষার মর্যাদা।

এবার আরও দুটি বিষয়ের উল্লেখ করছি। একটি আসামের ভাষা আন্দোলনের কথা। ১৯৬০ সালে আসাম ভাষা আইন পাস হয়। এই আইনে অসমীয়া ভাষাকে আসামের রাজ্য ভাষা করা হয়। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে বরাক উপত্যকার বাঙালিরা। ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেল স্টেশনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন এগারো জন। এই আন্দোলনের পর আসাম সরকার ভাষা আইন সংশোধন করে এবং বরাক উপত্যকার জন্য সরকারি ভাষা হিসেবে বাংলা বহাল থাকে। ১৯ মে বরাক উপত্যকার শহীদ দিবস। যে এগারো জন শহীদ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নারী। তার নাম কমলা ভট্টাচার্য।

পরবর্তী বিষয়টি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'। কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন ভাষাভাষীর দশজন ব্যক্তিকে নিয়ে তারা যে সংগঠনটি গঠন করেছিলেন তার নাম 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভারস অব দ্য ওয়ার্ল্ড।' এই দশজনের মধ্যে ছয় জন ছিলেন নারী।

মোট সাতটি ভাষার মানুষ এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। আবেদন পত্রটি জাতিসংঘের মহাসচিবের কাছে তাঁরা পাঠান।

তাঁদেরকে জানানো হয় যে বিষয়টি নিয়ে ইউনেস্কোতে যোগাযোগ করতে হবে। সে অনুযায়ী তাঁরা ইউনেস্কোর মহাপরিচালকের নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। ইউনেস্কো উক্ত গ্রুপটিকে জানায় যে, এ ধরনের প্রস্তাব ইউনেস্কোর সদস্য রাষ্ট্রসমূহের যে কোনো জাতীয় কমিশন কর্তৃক উত্থাপিত হতে হবে। ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন একজন নারী। তার নাম Anna Maria Mailof. তিনি বিষয়টিকে আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন। তিনি রফিকুল ইসলামকে জানিয়ে ছিলেন যে, এই প্রস্তাবটি তাঁর নিজ দেশের সরকারের কাছ থেকে আসতে হবে। হাতে সময় আছে মাত্র দুই দিন। সেই সময়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয়টি কার্যকর করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেছিলেন, নথীর আনুষ্ঠানিকতা পরে হবে। প্রস্তাবটি ইউনেস্কো সদর দপ্তরে যথাসময়ে পেশ করেন। এটি ছিল নারীর প্রজ্ঞার এক অসাধারণ সিদ্ধান্ত।

১৯৯৯ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ভাষা ও সংস্কৃতি বিভিন্নতা সংরক্ষণ এবং শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বহুভাষা ব্যবহারে অগ্রগতি অর্জন সম্পর্কিত ইউনেস্কোর নীতিমালার আলোকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে প্রতি বছর তা বিশ্বের সকল সদস্য রাষ্ট্র ও ইউনেস্কো সদর দপ্তরে উদযাপন করার জন্য একটি রেজুলিউশন প্রস্তাব পেশ করে। ইউনেস্কো ২৮টি সদস্য রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রস্তাব লিখিতভাবে সমর্থন করে। Draft Resolution-35 হিসেবে চিহ্নিত বাংলাদেশের প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর ল্যাঙ্গুয়েজ ডিভিশন রির্পোট Advisory Committee on Linguistic Pluralism and Multilingual Education-এর মাধ্যমে বিবেচেনার জন্য একজিকিউটিভ বোর্ডে প্রেরণের পক্ষে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অভিমত ব্যক্ত করেন। এরপর ১২ এবং ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে কমিশন-২ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশের প্রস্তাবটি পাশ করা হয় ও সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থাপন করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর সাধারণ সম্মেলনের অধিবেশনে সকল সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে তা প্রতি বছর সকল সদস্য রাষ্ট্র ও ইউনেস্কো সদর দপ্তরে উদযাপন করার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন এবং শহীদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাত্রা দেয়ার জন্য তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলন ছিল তাঁর শৈশবের সময়। বঙ্গবন্ধু তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে লিখেছিলেন : 'হাসু আমার গলা ধরে প্রথমেই বলল, ''আব্বা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, রাজবন্দিদের মুক্তি চাই।'' একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা ঢাকায় ছিল, যা শুনেছে তাই বলে চলেছে।' পাঁচ বছর বয়সে যে শিশু এই স্লোগান উচ্চারণ করেছিল পরিণত বয়সে তাঁর হাতেই ভাষা-দিবসটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে।

বলতে চাই ঘর-রাস্তা-মিছিল-গণপরিষদ ছিল নারীর জন্য এক সফল বাস্তবতা। অন্যদিকে ভ্যাঙ্কুভার , প্যারিস এবং বাংলাদেশ সরকার প্রধানের অফিস ছিল নারীর জন্য আরেক সফল বাস্তবতা। সব জায়গায় নারী তার পদক্ষেপটি দৃঢ়ভাবে ফেলেছেন।

১৯৯৮ সালে *মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভারস অব দ্য ওয়ার্ল্ড*-এর দশ জন মানুষ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ আজকের এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট। এ কাজটিও করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করেছেন গভীরভাবে। শিক্ষা-গবেষণার জন্য একটি বড়ো ক্ষেত্র তৈরি করবে এই প্রতিষ্ঠান এই প্রত্যাশা নাগরিক সমাজের। মাতৃভাষার মর্যাদার বিষয়টি আন্তর্জাতিক সমাজে আরও গ্রহণযোগ্য করার জন্য ইউনেস্কোর সহযোগিতায় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে একটি পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে। 'বাংলাদেশ-ইউনেস্কো ভাষা ও সাহিত্য' পুরস্কার শিরোনামে একটি পুরস্কার প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাহলে আমাদের শহীদ দিবস বিশ্বের ভাষাপ্রেমী মানুষের কাছে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করবে।

ভাষা আন্দোলন থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পর্যন্ত নারীর প্রজ্ঞার কথা বলেছি। এমন একটি সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় থাকবেন।

মাতৃভাষা ও জাতিসত্তা

মফিদুল হক

'বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী'-বিশ শতকের মানুষ সম্পর্কে এমন উক্তি ছিল কবি সুধীন দত্তের। 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়'–এমত উক্তি তাঁরই সমসাময়িক আরেক কবি জীবনানন্দ দাশের। দুই কবির দুই উক্তির মধ্যে আপাত-ফারাক যাই থাকুক তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, উভয়ের উপলব্ধির ভেতর রয়েছে সত্যের উপাদান। মানুষের একক সত্তার কাছেই মানুষ শেষপর্যন্ত দায়বদ্ধ, কিন্তু সেই মানুষই তো আবার পারিবারিক, সামাজিক, গোষ্ঠীগত, রাষ্ট্রিক, বৈশ্বিক কত-না বন্ধনে যুক্ত। এই বন্ধন কখনো হয় সাময়িক, কখনো দীর্ঘস্থায়ী, আর কখনো-বা বলা যায় চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী বন্ধনের মধ্যে রয়ে যায় জন্মের দাগ–যেমন আছে মানুষের জন্মপরিচয়, কিংবা জাতি পরিচয়। মানুষ জন্মের সূত্র কখনোই মুছে ফেলতে পারে না, তা সে জন্মসূত্র থেকে যত দূরেই থাকুক। বারাক ওবামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়ে উঠতে পারেন কিন্তু জন্মসূত্রে তিনি যে মিশ্রঐতিহ্যের ধারা বহন করছেন, সেটা তো কিছুতেই মুছে যাওয়ার নয়। ঠিক তেমনই এক মানববন্ধনী রচনা করে মাতৃভাষা, যা কখনো ভুলে যাওয়ার নয়, মুছে যাওয়ার নয়, যদিও ক্ষেত্র কিংবা পাত্র বিশেষে ঘটতে পারে এর রূপ-রূপান্তর। কয়েক প্রজন্মের মিলনে-মিশ্রণে বিচ্ছিন্নতায়-বিয়োজনে হয়তো নবপ্রজন্মের মানবসন্তান মাতৃভাষা ব্যতিরেকে ভাষার অন্যতর রূপে আশ্রিত হতে পারেন, কিন্তু মানবজাতির অধিকাংশ সদস্য মাতৃভাষা সূত্রে হয় একতাবদ্ধ এবং সেই বন্ধন প্রবাহিত হয় কাল থেকে কালান্তরে। মাতৃভাষা অবলম্বন করে গোষ্ঠীগত যে সত্তা গড়ে ওঠে সেটাও তাই কখনো মুছে যাওয়ার নয়।

জাতীয়তা আসলে ঐক্যের নির্মাণ, মানুষকে তার সমরূপে একত্র করবার উপায়। এই উপায় ব্যবহার করে সমাজ সংহত হতে পারে, আবার অপব্যবহার দ্বারা অপরে আক্রান্ত হতে পারে।

মুছে যাওয়ার নয় বটে, তবে মুছে ফেলবার আয়োজনে কোনো কমতি কখনো ঘটেনি। নিজ ভাষা বর্জন করে পরভাষা অবলম্বনের প্রয়াস তো বহুকাল থেকে দৃশ্যগোচর হয়েছে। কোনো ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী যখন কর্তৃত্ববান বিভাষী গোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়েছে তখনই জেগে উঠেছে ভাষা নিয়ে সংঘাত। চর্যাপদের ভাষার মধ্যে নিহিত ছিল বাংলাভাষার বীজ। নবম-দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মানুসারী সাধারণ মানুষ যখন চর্যাগীতির মাধ্যমে জীবনের অর্থময়তা খুঁজে ফিরছিলেন তখন রাজশক্তির পালাবদলে রাজভাষা হিসেবে সংস্কৃতের অধিষ্ঠান চর্যাগানকে অপাঙক্তেয় করে তোলে। রাজরোষ মাতৃভাষা ধর্মচর্চাকে নির্বাসন-দণ্ড দিয়েছিল নেপাল কিংবা তিব্বতের মঠে অথবা রাজসভায়। তারপরেও নির্বাসিত বাংলাভাষা একেবারে হারিয়ে যায়নি, লোকভাষারূপে আবারও তো রাজ-স্বীকৃতি ফিরে পেয়েছিল সুলতানি বাংলায়, মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলিম মিলিত সাধনায় ঘটেছিল এর স্ফুরণ। তবে সেখানেও রাজানুগ্রহ-প্রত্যাশী মানুষ তো ছিল সমাজে যারা দরবারের ফার্সি-চর্চার অনুগত হয়ে বাংলাকে করেছিল অবহেলা। এদের লক্ষ করেই মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম উচ্চারণ করেছিলেন ধিক্কার: 'যেসবে বঙ্গে ত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/সেসব কাহার জন্ম নির্ণয়ে না জানি।'

মাতৃভাষা অবলম্বন করে জাতিসত্তার যে বিকাশ নানা টালমাটালের মধ্যেও তার সেই অভিযাত্রা ছিল অব্যাহত। উপনিবেশিক আমলে পাশ্চাত্যের সঙ্গে বাংলার ঘটে আরেক ধরনের পরিচয়, সংযোগ ও সংঘাত। সাত সমুদ্র পারের শাসকগোষ্ঠী ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এমন এক শংকর

জাতি তৈরি করতে চেয়েছিল যারা গাত্রবর্ণে হবে কৃষ্ণকায়, চিন্তা চেতনায় শ্বেতাঙ্গ। সেজন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতবাসীকে তাঁদের মাতৃভাষা থেকে বিযুক্ত করা। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চললেও এই কাজে উপনিবেশিকবাদীরা যে অনেকটাই সফল হয়েছিলেন তা বলা যায়। উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে সেখানে রাজনীতি ও অর্থনীতি গুরুত্ব পেলেও ভাষার প্রশ্ন বিশেষভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রশ্ন বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে দীনদুখিনি মায়ের দোওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেয়ার কথা বলেছিলেন কবি, এর পাশাপাশি উঠে এসেছিল স্বদেশি সমাজ নির্মাণে বিকল্প জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রশ্ন। বিদেশাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা-সংস্কৃতি বর্জন নয়, বরং স্বাদেশিক বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে তা আলিঙ্গন করা, এমনই ছিল পদানত দেশের জাতীয় নেতাদের অভিপ্রায়।

কিন্তু ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আক্রান্ত হয়েছিল নানা জটিলতার দ্বারা, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করছিল নতুন নতুন অভিঘাত। অভ্যন্তরীণ এই দ্বন্দ্ব জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে দিগভ্রান্তি আরো বাড়িয়ে তোলে, মাতৃভাষা কখনোই তার শক্তিময়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৃষ্টিশীল ও নিষ্ঠাব্রতী নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভাজন মুসলমানদের আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানের দাবি ক্রমে জোরদার করে তুলতে থাকে এবং পাকিস্তানের দাবি যে-দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে চাচ্ছিল সেখানে উপমহাদেশের মুসলমানরা এক জাতি হিসেবে গণ্য হতে লাগলো। এমন দৃষ্টিভঙ্গি ভারত'বর্ষীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা চর্চার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে বিঘ্ন ঘটায়। বরং মুসলিম লীগের উত্তর-ভারতীয় নেতৃত্ব, আরবিতে অজ্ঞ ফারসিতে বকলম হলেও মনে করলেন উর্দুই হতে পারে নানা ভাষাভাষী ভারতীয় মুসলমানদের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা বা সর্বজনীন ভাষা। সর্বজনীন ভাষা যদি কিছু থাকেও সেটা যে মাতৃভাষার বিকল্প হতে পারে না, তেমন কথা বলবার লোক তখন বিশেষ ছিল না। ঘোর এক সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার মধ্যে জন্ম নিল পাকিস্তান রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের কাঠামো ও ভিত্তি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে মুসলমানদের পাক-ভূমি হিসেবে যার উদ্ভব। ১৯৪৭-এর মধ্য আগস্টে ভারতভাগের পরিণতিতে ১২০০ মাইলের ভৌগোলিক দূরত্বসম্পন্ন দুই অংশ নিয়ে যে নতুন রাষ্ট্র সেখানে পশ্চিমাংশের সঙ্গে পূর্বাংশের কোনো সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না বললেই চলে।

সমাজতাত্ত্বিক বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন জাতীয়তাকে বলেছিলেন কল্পিত নির্মাণ, তাঁর মতে যারা জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে নিজেদের গণ্য করেন তারা তো কেউ কাউকে কখনো দেখেননি, জানেননি, আর তাই কল্পনায় এই সত্তা অনুভব ছাড়া আর কীভাবে ন্যাশনালিটি গঠিত হতে পারে? সেই বিচারে পাকিস্তান অবশ্য কল্পিত জাতিসত্তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। কিন্তু বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন জাতিসত্তার আরো দুই বড় বৈশিষ্ট্যের দিকে একেবারেই নজর দেননি, এর একটি হলো ভাষা, যে ভাষার ব্যবহার সব মানুষকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং তারা অভিন্ন ঐতিহ্য ও সমসাময়িকতা ভাষাগত রূপায়ণের মাধ্যমে একত্র হন, যে অনুভূতির রয়েছে বাস্তব রূপ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভৌগোলিক, যে মাটিতে তাদের বসবাস ও জীবনধারণ, সেটা ভাষার ঐক্যকে বাস্তব ভূগঠনগত ঐক্যের যোগান দেয়। জাতীয়তা আসলে ঐক্যের নির্মাণ, মানুষকে তার সমরূপে একত্র করবার উপায়। এই উপায় ব্যবহার করে সমাজ সংহত হতে পারে, আবার অপব্যবহার দ্বারা অপরে আক্রান্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে ধর্মের ঐক্যও মানুষকে একত্র করে, কিন্তু ধর্মের ঐক্য তো জাতিসত্তার ঐক্য নয়, কেননা একই ধর্মের আওতায় বসবাস করতে পারে নানা জনগোষ্ঠীর মানুষ, নানা দেশের নানা জাতির ও নানা বর্ণের ও গোত্রের মানুষ। ফলে ধর্ম যে ঐক্যবন্ধন তৈরি করে সেটা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটা কেবল ঐ বিশেষ ধর্মানুসারীদের ঐক্য, সেখানে অন্য ধর্মের কারো ঠাঁই নেই, আর তাই ধর্ম জাতিসত্তার বিকল্প হতে পারে না। কেউ নিজ ধর্ম পাল্টে ফেলতে পারে রাতারাতি, খ্রিষ্টান থেকে হয়তো হয়ে পড়লেন মুসলমান, কিন্তু মাতৃভাষা তো কেউ পাল্টাতে পারেন না, তিনি হতে পারেন দ্বিভাষিক কিংবা বহুভাষী, তবে মাতৃভাষা বহন করতে হবে আজীবন, ব্যবহারহীনতা অথবা অপব্যবহারে তা বিলীয়মান কিংবা বিকৃতি হতে পারে, তারপরও মাতৃভাষার তিলক কপাল থেকে কখনো মুছবার নয়। তাই জাতিসত্তাও কখনো পাল্টে ফেলবার নয়। তেমনি স্বদেশের ভূগোলও কেউ পাল্টে দিতে পারেন না, যা প্রভাবিত করে জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড তথা জীবনাচার। কিন্তু পাকিস্তান চেয়েছিল ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র

ও ধর্মভিত্তিক জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠা করতে, আর তাই শুরু থেকেই অসঙ্গতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল এবং অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটতে শুরু করেছিল রাষ্ট্র, যদিও প্রাথমিক উন্মাদনায় সেটা সবার কাছে বোধগম্য ছিল না।

পাকিস্তান বাস্তবে বহু ভাষাভাষী বহুজাতিক রাষ্ট্র, কিন্তু ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রের আদলে পাকিস্তানও রাষ্ট্র ও জাতিকে এক করে ফেলতে প্রলুব্ধ হয়েছিল। তবে রাজনীতিবিদরা চাইলেই তো আর সমাজ ও ইতিহাসের বাস্তবতা বদলে দিতে পারেন না। পাকিস্তানের আন্দোলন হয়েছিল বায়বীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের। ভিত্তিতে মুসলিম জাতিসত্তা উর্ধ্বে তুলে ধরে, কিন্তু পাকিস্তান যখন বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন নাগরিকদের জাতিসত্তা কি দাঁড়াবে, তারা কি দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী মুসলিম জাতি হিসেবে পরিচিত হবেন, নাকি নতুন এক পাকিস্তানি জাতি জন্ম নেবে ইতিহাসের দিন-তারিখ মান্য করে, সেইসব জটিল প্রশ্ন দেখা দিল সামনে। ভারতের মুসলমানের একাংশ যদি রাতারাতি 'পাকিস্তানি জাতি'তে রূপান্তরিত হয়, তবে কি বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী যারা রয়ে গেল ভারতে, পাকিস্তানের ভাষায় হিন্দুস্তানে, তারা হিন্দুস্তানি জাতিতে রূপান্তরিত হবে?

পাকিস্তান যে এক গোঁজামিলের রাষ্ট্র সেটা জানা যাচ্ছিল কতক সংকট থেকে, যার সমাধান দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সম্ভব ছিল না। প্রথম এবং বড় সংকট দেখা দিল ভাষার প্রশ্নে, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের সংবিধান সভার প্রথম অধিবেশনে স্থির হয়েছিল ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুকে পরিষদের ভাষা হিসেবে গণ্য করা হবে। পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ জনসাধারণের মুখের ভাষা বাংলা, আর তাই কুমিল্লার ধীরেন দত্ত প্রস্তাব এনেছিলেন যে, উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও পরিষদের ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। যৌক্তিক এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করবার মানসিকতা পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ছিল না। এর প্রতিবাদে ঢাকায় ছাত্রসমাজ প্রতিবাদী সভা ও মিছিলের আয়োজন করে। মার্চ মাসে এমনি এক মিছিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ছাত্রনেতা গ্রেপ্তার হলেন, যাঁদের মধ্যে ছিলেন তরুণ তুর্কি শেখ মুজিবুর রহমান। ঘটনা আপাতবিচারে ছোট, কিন্তু তাৎপর্যে বড়। এদিকে ১১ মার্চ পাকিস্তানের স্থপতি হিসেবে অভিহিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রথমবারের মতো ঢাকায় এসে রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করেন যে, উর্দু, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল সভার এক প্রান্ত থেকে, কণ্ঠ ক্ষীণ হলেও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে বিশাল।

পাকিস্তানের পূর্বাংশে যেমন ছিল বাংলাভাষাভাষী প্রদেশ পূর্ববাংলা, যে-নামপরিচয় ১৯৫৪ সালে করে দেওয়া হলো পূর্ব-পাকিস্তান, অপরদিকে পশ্চিম-পাকিস্তানে ছিল চার ভাষাভাষী প্রদেশ–সিন্ধু, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও পাখতুন তথা ব্রিটিশের দেওয়া উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এহেন পাকিস্তান ভাষাভিত্তিক জাতিপরিচয় মুছে দিতে উদ্যত হয়েছিল, নির্মাণ করতে চাইছিল ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা। গণতান্ত্রিক পথে সেটা অর্জন তাদের পথে সম্ভব হচ্ছিল না। সেজন্য শাসকগোষ্ঠী ধর্মকে ব্যবহার করলো ঢাল হিসেবে, আর সামরিক বাহিনীকে তরবারি রূপে। ধর্মের ধুয়া তুলে বাংলার ওপর নানা আঘাত হানবার প্রয়াস শুরু হলো। তথাকথিত 'ইসলামী বাংলা' প্রবর্তন, আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা–এসব ছিল এর এক ধরনের প্রকাশ। বাঙালি সংস্কৃতিও তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠলো এবং বাংলা ভাষার অধিকার দমন হলো এক প্রধান রাজনৈতিক এজেন্ডা–কেননা বাংলা ভাষার অধিকার অর্থ বাঙালি জাতিসত্তার স্বীকৃতি, যেটা দিতে পাকিস্তান সম্মত ছিল না।

সকল ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে বাঙালি জাতিসত্তার অমোঘ উদ্ভাসন আমরা দেখি ১৯৫২ সালে ভাষাভিত্তিক জাতিসত্তার জাগরণ ঘটায় একুশে ফেব্রুয়ারি এবং সেই চেতনার আলোকে স্নাত হয়ে বাঙালি জাতি খুঁজে পায় তার মুক্তিপথের নিশানা, জনকণ্ঠে সোচ্চারভাবে ঘোষিত হয়: 'তোমার আমার ঠিকানা – পদ্মা মেঘনা যমুনা'। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি মিলেমিশে জন্ম দেয় বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। ১৯৪৮ সালে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার দীপ্ত যে তরুণ হয়েছিলেন কারাবন্দি তাঁরই কণ্ঠে ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘোষিত হলো অমোঘ বাণী: 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

মাতৃভাষার অধিকার যে-জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দিল তার সামনে এখন বড়ো দায়িত্ব, স্বদেশি সমাজের বিকাশের পাশাপাশি বিশ্বের সকল মাতৃভাষার সংরক্ষণ, চর্চা ও বিকাশের সম্মিলিত সাধনায় এই দেশ নিশ্চয়ই পালন করবে তার যোগ্য ভূমিকা সেটাই আমাদের দায় ও প্রত্যাশা। কেননা ইতিহাসই তো বাংলাদেশের ওপর অর্জন করেছে এমন দায়িত্ব।

মাতৃভাষা

উদয় নারায়ণ সিংহ

'মাতৃভাষা' বলতেই অনেকে সমাসে আবদ্ধ 'মাতৃ' এবং 'ভাষা'-এই দুটি শব্দের অর্থচ্ছটার উপর নির্ভর করে এই নবগঠিত অবধারণার পরিভাষা তৈরি করতে চাইবেন। স্বাভাবিক কথায় 'মাতৃভাষা' বলতেই অনেকে বা বেশির ভাগ মানুষ মায়ের ভাষাকেই বোঝাবেন। অথচ এমনটা প্রায়ই হয় যে মা নিজেই বা পরিবারের বড়োরা শিশুর সঙ্গে একাধিক ভাষায় কথা বলছেন, আর তার ফলে শিশুটির ওই সব কটি ভাষাতেই সহজাত দক্ষতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে এক্কেবারে প্রথম থেকেই। এমনও দেখা গেছে যে কোনো কোনো মা বিয়ের পরে স্বামীর বা পতিগৃহের ভাষাটিকে এমনভাবে আত্মকরণ করলেন যে, মায়ের নিজস্ব বাণী গেল হারিয়ে। ফলে, 'মাতৃভাষা' পরিভাষাটির সংজ্ঞা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। মানুষ যে ভাষায় কথা বলতে সবচেয়ে বেশি পারদর্শী, অনেকে সেটিকেই 'মাতৃভাষা' বলে মেনে নেন। যে ভাষাটি অথবা ভাষাগুলি কোনো শিশু তার পিতামাতা বা অভিভাবকের কাছ থেকে ছোটবেলায় শিখেছে, তাকেই 'মাতৃভাষা' বলতে কেউ দ্বিধা করেন না। আবার যে-ভাষাটি যে অঞ্চলে বহুল প্রচলিত, সে অঞ্চলের মানুষের মতো এই বিস্থাপিত ও বহিরাগত শিশুটিও হয়তো সেই ভাষাটিতে কথা বলতে সক্ষম এবং তাকেই সাধারণভাবে মাতৃভাষা বলে মেনে নিচ্ছে।

নিজের মা-কে সম্মান জানানো ও ভালোবাসার পাশাপাশি পৃথিবীর সকল মায়েদেরই ভালোবাসার ভাবনাও আমাদেরই লালন করতে হবে এবং সেই মাতৃ-প্রেম ছড়িয়েও দিতে হবে আমাদেরই।

'প্রথম আলো'-র ২০১৩-র ২১শে ডিসেম্বরে 'পাঁচমিশালি' কলামে মুনীর চৌধুরী ওঁর একজন পরিচিত বয়স্ক মানুষের (বুজুর্গের) ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে লিখেছেন : ''পণ্ডিতের বাংলা তাঁর মাতৃভাষা নয়। একেবারে নির্জলা মায়ের বুলিই তাঁর মাতৃভাষা। মামার বাড়ির সকল আবদার আমারও খুব প্রিয়, কিন্তু তাই বলে মাতুলালয়ের ভাষাই আমার মাতৃভাষা। এমন কথা স্বীকার করতে আমি নারাজ। আমি কি অপরাধী? এক অধ্যাপক আছেন, তিনি তাঁর অঞ্চলের বুলির অকৃত্রিম ভক্ত। তিনি বই ছাপিয়ে প্রচার করেছেন যে, তাঁর দেশে কৃষকে বিরিষ বলে, অতএব তিনিও বিশুদ্ধ বাংলায় কৃষকে বিরিষ রূপে লিখবেন ও বলবেন না কেন? যিনি বলবেন তিনি বলতে পারেন আমি বাধা দেবার কে? তবে আমার মাতৃভাষা বৃষভশক্তির হবে এমন সম্ভাবনা অনিবার্য মনে করি না।" প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা যদি এমন খাম-খেয়ালিপনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ব্যাকরণ-সম্মতভাবেও এগোতে চাই, তাহলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? যেমন উনি লেখা শুরু করেছেন এই ভাবে : "মাতৃভাষা সমাসবদ্ধ পদ। ব্যাকরণের নির্দেশ অনুযায়ী ষষ্ঠী তৎপুরুষ। অভিধানে অর্থ লেখা আছে স্বদেশের ভাষা। কিন্তু অভিধানের অর্থে সকলের চিত্ত সন্তুষ্ট হয় না। হওয়ার কথাও নয়। ভাষার স্বভাবই হলো অস্পষ্ট থাকা, অন্তরাল সৃষ্টি করা, হরবোলার কৌতুকে মেতে ওঠা। ভাষা খেলা করে জিবের ডগায়, ঘোষিত হয় গলার মধ্য দিয়ে, প্রাণ লাভ করে ফুসফুস থেকে। এও বাইরের সত্য। আসলে ওর জন্ম বুকের মধ্যে, উৎস মানুষের মন। মন কি কোনো নিয়মের বশ হতে চায়? একই ভাষা একজনের মুখে মধু, অন্য জনের মুখে বিষ। সকাল-বেলায় কলহের হাতিয়ার, দুপুরে কর্মের বাহন, অপরাহ্নে শ্রান্তির, সন্ধ্যায় স্বপ্নের।"

এ-প্রসঙ্গে মনে করা যাক *মুক্তধারা* নাটকের কথা। মহারাজ রণজিৎ যখন বলছেন : "যুবরাজকে

শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।" আর মন্ত্রী তার কারণ জানতে চাইছেন তখন রাজার কথা হলো : ''যে প্রজারা দূরের লোক, তাদের কাছে গিয়ে 'ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙ্গে যায়'। সেই জন্য ওঁর কুমারের শিবতরাইয়ে যাওয়া ভালো লাগেনি। তখন মন্ত্রী ওঁকে যুবরাজের যাওয়ার আসল কারণটা ধরিয়ে দিলেন : "কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে তিনি হয়তো কোনো সূত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার "ঝরনাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে।" তাই যুবরাজকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে সেখানে পাঠানো হয়েছিল অথচ রাজা বুঝলেন যা তা ওঁর পরের সংলাপেই স্পষ্ট : "তা তো জানি-ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝরনাতলায় গিয়ে শুয়ে থাকত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী হয়েছে অভিজিৎ, এখানে কেন?' ও বললে, 'এই জলের শব্দে আমি আমার 'মাতৃভাষা শুনতে পাই।' "মায়ের সঙ্গে, মায়ের ভাষার সঙ্গে মাটির এই টানটি তো ভোলবার নয়।"

অনেকেই বলবেন মানুষের অস্তিত্বের প্রধান তিনটি অবলম্বন "মা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি।" মুশকিল হচ্ছে আমরা যদি দাবি করি মাতৃভাষাই হলো মানুষের 'দেশের ভাষা' এবং 'জাতির ভাষা' তা হলে চিনে, জাপানে, মালদ্বীপে বা বাংলাদেশে সে কথা চলবে, প্রায় স্বতঃসিদ্ধও। কিন্তু নেপালে বা ভারতে– এমনকি দ্বিভাষাময় দ্বীপ-দেশ শ্রীলংকাতেও এই যুক্তিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০৪) নিজের *প্রথমে মাতৃভাষা পরভাষা পরে* গ্রন্থে (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড) নিজ-ভাষা এবং অন্য-ভাষা নিয়ে তার বাংলা ভাষাপ্রেম ও এই ভাষার বিশেষ জ্ঞাতা রূপে যাই বলুন, আমাদের কিন্তু ভাবনা-চিন্তা করতে হবে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মাতৃভাষা নিয়ে। অন্য কোনো নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাই আমাদের 'পর' নয়– এই অঙ্গীকার কিন্তু ইউনেস্কোর দ্বারা একুশে ফেব্রুয়ারিকে বাঙালির মাতৃভাষার জন্য আত্মদানের স্বীকৃতি রূপে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করা হয়ে গেছে।

আমরা যেন কোনো ভাষাগত ঔপনিবেশিকতা শুরু করি নিজ নিজ মাতৃ-ভাষাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বান কি মুনের কথায় প্রায় তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে ।

ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির বিষয়ে বিশেষ কমিটির উদ্বোধনী অধিবেশনে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন : "ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির বিষয়ে সবাইকে নিয়ে নতুন ধরনের এক সংলাপ শুরুর এখন সময় এসেছে।" কারণ মহাসচিবের কথায়, "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অতীতের যেকোন সময় থেকে এখন আরো বেশি অনুভব করছে যে আধুনিক বিশ্বে ঔপনিবেশিকতার কোন স্থান নেই। ...আমরা জানি যে, বিশ্ব এখন বড়ো ধরনের এক পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে। অনেক পুরোনো কাঠামো ভেঙে পড়ছে। নতুন ব্যবস্থার রূপায়ণ ঘটছে।" এই প্রসঙ্গেই ইউনেস্কোর মহাপরিচালক, আইরিনা বোকোভার বক্তব্যও বেশ তাৎপর্য রাখে : "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো ভাষা এবং বইয়ের মধ্যেকার যোগসূত্র অনুসন্ধান করা। ...কিছু কিছু দেশে স্থানীয় ভাষায় বই এবং পাঠ্যপুস্তকের অভাব উন্নয়ন এবং সামাজিক অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা লংঘনের প্রতিফলনও এতে দেখা যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ...ডিজিটাল উপকরণসমূহ এক্ষেত্রে কিছুটা শূন্যতা পূরণ করলেও তা যথেষ্ট নয়। ... মাতৃভাষাসহ যতো বেশী ভাষায় সম্ভব বই এবং পাঠসামগ্রী বিতরণ করা প্রয়োজন।" (http:www.unmultimedia.org/radio/bangla/archives/877) তাই জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা- ইউনেস্কোর ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা শুরু করে যার লক্ষ্য হচ্ছে ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং বহুভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম প্রসার ঘটানো ।

নিজের মা-কে সম্মান জানানো ও ভালোবাসার পাশাপাশি পৃথিবীর সকল মায়েদেরই ভালোবাসার ভাবনাও আমাদেরই লালন করতে হবে এবং সেই মাতৃ-প্রেম ছড়িয়েও দিতে হবে আমাদেরই। এই সব বক্তব্য থেকে একথাই বেরিয়ে আসছে। যদি আমরা 'সূরা আর-রাহমান, আয়াত : ৩-৪ এর এই কথা মেনে নিই যে আল্লাহ্ তালা বলেছেন : "তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাব প্রকাশ করতে (ভাষা) শিখিয়েছেন", এবং আয়াত ২২-এর কথাটিও স্মরণে রাখি : "তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য," যেমনটা পবিত্র কোরআনে কথিত হয়েছে, তাহলেও মাতৃ-ভাষা প্রেমকে সর্বজনীন অর্থেই নিতে হবে আমাদের।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কিছু পুরোনো পাতা উল্টে দেখলে দেখা যাবে আমাদের অনেক লেখক-সাহিত্যিকই এই বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত আমাদের জানিয়েছেন। 'সাহিত্য সম্মিলনের রূপ' বক্তৃতায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন– এই সম্মিলনে আমরা সবাই এসেছি "জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে। অথবা যুক্তি-তর্কের বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য অবলম্বন করে এখানে এসে আমরা সমবেত হইনি, এসেছি হৃদয়ের আদান-প্রদানে পরস্পরের সুনিবিড় পরিচয় নিতে। মাতৃভাষার সেবক আমরা– সাহিত্যের পূর্ণ মিলনক্ষেত্র ছাড়া এতগুলি হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোনেরা আমরা একাসনে বসে এমনভাবে মিলতে পারতাম আর কোন সভাতলে?" মাতৃভাষা যে মানুষজনকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দেয় সে-কথাই ওঁর বক্তব্য থেকে ফুটে উঠেছে। অন্য ভাষা-ভাষীরাও যে বঙ্গভূমিতে (আজ যাকে আমরা 'বঙ্গ' বলছি) বহু যুগ ধরে বাস করে তারাও যে বহুলাংশে 'বাঙালি'ই একথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বহুদিন আগে 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি (*বিবিধ প্রবন্ধ*, দ্বিতীয় খণ্ড) প্রবন্ধে বলেছিলেন যে প্রথমে দেখতে হবে যে আমরা 'বাংলা' কাকে বলছি?

তিনি লিখেছেন : "প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালা কাহাকে বলিতেছি। কেননা, বাঙ্গালা নাম অনেক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এক অর্থে পেশোর পর্যন্ত বাঙ্গালার অন্তর্গত যথা, "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি" "বেঙ্গল আর্ম্মি।" আর এক অর্থে বাঙ্গালা তত দূর বিস্তৃত না হউক, মগধ, মিথিলা, উড়িষ্যা, পালামৌ, উহার অন্তর্গত এই সকল প্রদেশ বাঙ্গালার লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীন। এই দুই অর্থের কোন অর্থেই "বাঙ্গালা" শব্দ এ প্রবন্ধে ব্যবহার করিতেছি না। যে দেশের লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, সেই বাঙ্গালি; আমরা সেই বাঙালি'র উৎপত্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমের সংজ্ঞায় একটা বৃহত্তর 'বাঙ্গালি' মানসের সীমারেখা আঁকার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। বাংলাভাষীর সংজ্ঞা দিতে গেলে এঁদের জুড়তে হবে একথা মেনে নিলেও বাংলা মাতৃ-ভাষাভাষীর আওতায় অবশ্যই এঁদের ফেলা যাবে না। বঙ্কিমের বক্তব্য স্পষ্ট : "যে সকল অনার্য্যজাতি বাঙালার আর্য্য কর্তৃক দূরীভূত হইয়াছে", তাঁদেরকে উনি বাংলা সংজ্ঞার বাইরে রাখতে চান কিন্তু বলছেন, দেখতে হবে কাদের আমরা আপন করে নিয়েছি এবং কারা আর্য্য বাঙালিদের সঙ্গে মিলে-মিশে গেছে; লিখছেন :

"বাঙ্গালার ভিতরে ও বাঙ্গালার পার্শ্বে কোন্ কোন্ অনার্য্যজাতি বাস করিতেছে-দুইই দেখিতে হইবে।"

দেখা যাক, এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সবিস্তারে কি বলছেন : ''উত্তরসীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে দেখিতে পাই, খামটি, সিংফো, মিশ্মি, চুলকাটা মিশ্মি। তারপর অপর জাতি, তাহাও অনেক প্রকার। যথা– পাদম্ মিরী দফা ইত্যাদি । তার পর আসাম প্রদেশের নাগা, কুকি, মণিপুরি; কৌপয়ী; তাহার বাহিরে মিকির, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো জাতি। আসামের মধ্যে দেখিতে পাই কাছারি বা বোড়ো, মেচ্‌ও। ধিমালজাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদিগের নিকট কুটুম্ব কোচজাতি। তৎপরে উত্তরে হিমালয় পর্বতের ভিতরে বাস করে, ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী (প্রাচীন কিরাত)। তার পর বাঙ্গালার পূর্ব দক্ষিণ সীমায় মগ, লুসাই, কুকি, কারেন্, তালাইন্ প্রভৃতি জাতি। ত্রিপুরার ভিতরেই রাজবংশী নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে; বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ডা, কোঁড়োয়া ওঁরাও বা ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনার্য্যজাতি বাস করে। এই শেষোক্ত কয়েকটি জাতির সম্বন্ধেই আমাদের অনেকগুলি কথা বলিতে হইবে। উত্তর ও পূর্বের অনার্য্যদিগের সঙ্গে আমাদিগের ততটা সম্বন্ধ নাই, তাহারা অনেকেই হালের আমদানি।

আমরা কেবল কয়েকটি প্রধান জাতির নাম করিলাম– জাতির ভিতর উপজাতি আছে এবং অন্যান্য জাতি আছে। প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের কথাও বলিতে হইবে।"

ভাষাতাত্ত্বিকদের পক্ষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উনি তুলেছেন বিবিধ প্রবন্ধে : "এমন কি হইতে পারে না যে, ভাষা এক জাতীয়, বংশ অন্যজাতীয় একাধারে সমাবিষ্ট হইয়াছে? এমন কি হইতে পারে না যে, পরাজিত জাতি জেতৃগণের ধর্ম, জেতৃগণের ভাষা গ্রহণ করিয়া জেতৃদিগের জাতিভুক্ত হইয়াছে?" তার কারণ উনি ইউরোপের উদাহরণ দেখিয়ে বলছেন যে স্পেন ও পর্তুগালে এমনটা তো হয়েছেই, ফরাসী দেশেও তাই : "ফ্রান্সের বর্তমান ভাষা লাটিন-মূলক, কিন্তু ফরাসী জাতির অস্থিমজ্জা কেল্টীয় শোণিতে নির্মিত। প্রাচীন গলেরা রোমকগণ কর্তৃক পরাজিত ও রোমকরাজ্যভুক্ত হইলে পর রোমীয় সভ্যতা গ্রহণ করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রোমীয় ভাষা অর্থাৎ লাটিনভাষা গ্রহণ করে। যখন পশ্চিম রোমকসাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন

গলদিগের মধ্যে লাটিনভাষাই প্রচলিত ছিল, পরে তাহারই অপভ্রংশে বর্তমান ফরাসী ভাষা দাঁড়াইয়াছে।" অতএব, মাতৃভাষার মধ্যে যে অনেক ইতিহাস, অনেক ও বিচিত্র রক্তের স্রোত আছে লুকিয়ে একথা আমাদের আধুনিকতার প্রথম পর্বেই নানান বিদগ্ধ জনের লেখায় পাই। এই লেখাগুলির মধ্যে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণ, বক্তব্য, অন্যের কথার বা কাজের ওপর মন্তব্য আমাদের অনেক বেশি সমৃদ্ধ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। এখানে অবশ্য কয়েকজন রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন– এদের মধ্যেই-কবি রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষা নিয়ে যে উচ্ছ্বাস ছত্রে-ছত্রে দেখিয়েছেন বা নাট্যকার-গল্পকার রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'মাতৃভাষা' কথাটি যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তার সঙ্গে প্রাবন্ধিক-দার্শনিক ও ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ একেবারেই স্বতন্ত্র।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে বঙ্কিম-প্রয়াণের পর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "আমাদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্য ব্যবসায়ী তাঁহারা বঙ্কিমের কাছে যে কী চিরঋণে আবদ্ধ তাহা যেন কোনো কালে বিস্মৃত না হন। একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো এক তারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল, বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাতে এক-একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণা যন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত তাহা আজ বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুব পদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। যিনি আমাদের মাতৃভাষাকে সর্ব প্রকার ভাব প্রকাশের অনুকূল করিয়া গিয়াছেন তিনি এই হতভাগ্য-দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চির সম্পদ দান করিয়াছেন। তিনি স্থায়ী জাতীয় উন্নতির একমাত্র মূল উপায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।" (*আধুনিক সাহিত্য*-গ্রন্থে 'বঙ্কিমচন্দ্র' থেকে)।

ফিরে আসি রবীন্দ্রনাথের নিজের গদ্য-রচনায়। 'গোরা'-য় হারান বাবু যেখানে সুচরিতাকে বিয়ের প্রস্তাব বাধ্য হয়ে ললিতার সামনেই দিচ্ছেন– ঠিক করতে চাইছেন বিবাহের দিনপঞ্জি– সেখানে সুচরিতার মৃদু স্বরে সুস্পষ্ট প্রত্যাখ্যানকে উনি বুঝতে পারছেন না বা বুঝতে চাইছেন না– একথা তুলে ললিতা যখন ওঁকে খোঁটা দিয়ে বলছেন উনি বাংলা ভাষা ভুলে গেলেন কিনা– তখন মর্মাহত পানুবাবুর উক্তি লক্ষণীয়। প্রসঙ্গটি উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

'সুচরিতা কথা শেষ করিতে না দিয়াই কহিল, "না"।
সুচরিতার মুখে এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট এবং উদ্ধত "না" শুনিয়া হারানবাবু থমকিয়া গেলেন সুচরিতাকে তিনি অত্যন্ত বাধ্য বলিয়া জানিতেন। সে যে একমাত্র "না" বাণের দ্বারা তাঁহার প্রস্তাবটিকে এক মুহূর্তে অর্ধপথে ছেদন করিয়া ফেলিবে, ইহা তিনিও মনে করেন নাই। তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "না! না মানে কী? তুমি আরো দেরি করতে চাও?"

"সুচরিতা কহিল, "না"।
হারানবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তবে?"
সুচরিতা মাথা নত করিয়া কহিল, "বিবাহে আমার মত নেই।"
হারানবাবু হতবুদ্ধির ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মত নেই? তার মানে?"
ললিতা ঠোকর দিয়া কহিল, "পানুবাবু, আপনি আজ বাংলা ভাষা ভুলে গেলেন নাকি?"
হারানবাবু কঠোর দৃষ্টির দ্বারা ললিতাকে আঘাত করিয়া কহিলেন, "বরঞ্চ মাতৃভাষা ভুলে গেছি এ কথা স্বীকার করা সহজ, কিন্তু যে মানুষের কথায় বরাবর শ্রদ্ধা করে এসেছি তাকে ভুল বুঝেছি এ কথা স্বীকার করা সহজ নয়।" (পৃ. ১৫৭)

মাতৃ-ভাষা জানা ও না-জানা যে একটা আব্রুর মত কাজ করে সে কথা রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'দুরাশা'-য় দেখেছি যেখানে একজন হিন্দি বা উর্দু-ভাষী নবাবদুহিতার সাধারণ মানুষের মত পথে একাকিনী সুদীর্ঘ ভ্রমণের বৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হবে কি না, সেকথা ভাবতে ভাবতে এবং যাত্রা শেষের কাহিনি শুনতে শুনতে কাহিনির নায়ক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙা হিন্দিতে বলিলেন, "বেয়াদবি মাপ করিবেন, শেষদিককার কথাটা আর-একটু খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়"। নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম, আমার ভাঙা হিন্দিতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস হিন্দিতে বাৎ চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙিত না, কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান, সেইটেই একটা আব্রু"। ঠিক তেমনিভাবে *গল্পগুচ্ছের* 'হৈমন্তী' গল্পে দেখছি বিবাহের প্রস্তাবেই নায়কের মনের মধ্যে যেন দক্ষিণে হাওয়া দিতে লাগল এবং "কৌতূহলী কল্পনার কিশলয়গুলির মধ্যে একটা

যেন কানাকানি পড়িয়া গেল," এমত অবস্থায় নিজের ভাষা-সংক্রান্ত দুর্বলতা ও অক্ষমতা নিয়ে পরিহাস করতে গিয়ে গল্পকার লিখছেন : "না পারিলাম বাংলায় শিশুপাঠ্য বই লিখিতে, কারণ, সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই; আর, না পারিলাম কাব্য রচনা করিতে, কারণ মাতৃভাষা আমার জীবনের মধ্যে এমন পুষ্পিত হইয়া উঠে নাই যাহাতে নিজের অন্তরকে বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি। সেইজন্যেই দেখিতেছি, আমার ভিতরকার শ্মশানচারী সন্ন্যাসীটা অট্টহাস্যে আপনাকে আপনি পরিহাস করিতে বসিয়াছে।" এ কেমন কল্পনা যা বার-বার ফিরে ফিরে আসে নিশিদিন-পরিচয়হীন– "পরগৃহদ্বার হতে পথের মাঝারে"– কেননা এ যেন অন্য ভাষা, অন্য নদীর কলধ্বনি। *নৈবেদ্য*-র এই ৭৪-সংখ্যক কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

"এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না
মাতৃকলকণ্ঠসম, যেথায় সাজে না
কোমলা উর্বরা ভূমি নবনবোৎসবে
নবীন-বরন বস্ত্রে যৌবনগৌরবে

বসন্তে শরতে বরষায়, রুদ্ধাকাশ
দিবস-রাত্রিরে যেথা করে না প্রকাশ
পূর্ণপ্রস্ফুটিতরূপে, যেথা মাতৃভাষা
চিত্ত-অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা
কল্যাণী হৃদয়লক্ষ্মী, যেথা নিশিদিন
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয়হীন
পরগৃহদ্বার হতে পথের মাঝারে–"

পঙ্‌ক্তি কয়টি নিয়ে একটু বিস্তারে যাওয়া যাক। আমার মনে হয় কবি বলতে চেয়েছেন– মাতৃভাষার স্বাভাবিক গতিপথ হল "চিত্ত-অন্তঃপুরে" যাওয়া-আসা করা– তা-ই যদি সে না করে এমন জীবনে যদি সে থাকে সীমিত হয়ে, সেখানে আকাশও অবরুদ্ধ ("রুদ্ধাকাশ") যার ফলে না দিন ফোটে, না রাত্রি কমল, যেখানে কল্পনা পারে না প্রবেশ করতে ভাবের ঘরে, আর গিয়ে-গিয়েও বার-বার ফিরে আসে অন্যের দুয়ার থেকে সম্প্রেষণে ব্যর্থ হয়ে, তেমন ভূমি কি সাজতে পারে "কোমলা উর্বরা" হয়ে? এই যে অন্যের কাছে, অন্যের বাক-দুয়ারে গিয়েও সেখানে প্রবেশ না পাওয়া– এমন নিরানন্দাময় নিরুদ্যমে ভরা পৃথিবী "যেখানে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিরুদ্যমী, সেখানে ব্যক্তিসমষ্টির কার্য তৎপরতা একটা গুজবমাত্র। আমি উনি তুমি তিনি সকলেই নিদ্রা দিব, অথচ আশা করিব 'আমরা' নামক সর্বনাম শব্দটা জাগ্রত থাকিয়া কাজ করিতে থাকিবে" (*সমাজ* গ্রন্থের 'হাতে-কলমে' নিবন্ধ থেকে), কিভাবে সেখান থেকে পরিণত পৃথিবীতে যাওয়া যায় সেটাই আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। সে পৃথিবী কেমন হবে? তা হবে "সমলগ্ন সমতল উন্নত মহাদেশ, সে তো আজ পৃথিবীর পরিণত অবস্থা"..."এখনই যথার্থ পৃথিবী তৈরি হইয়াছে। আগে যেখানে ছিল মহাশিখর, এখন সেখানে হইয়াছে মহাদেশ"। এত দিনে হয়ত আমরা এমন এক 'স্বদেশ' খুঁজে তার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে পেরেছি "আমাদের পিতামাতারা যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আমাদের সন্তানেরা যেখানে আশ্রয় পাইবে বলিয়া আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, যেখানে কেহ আমাদিগকে হীন জ্ঞান করিবে না, কেহ আমাদিগের প্রতি অবিচার করিবে না, ...যেখানকার বালক-বালিকারা আমাদেরই গৃহের আলোক আমাদেরই গৃহের ভাবী আশা, যেখানে কেহ আমাদের মাতৃভাষা আমাদের দেশীয় সাহিত্য আমাদের জাতির আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠানকে কঠোরহৃদয় বিদেশীয়ের ন্যায় অকাতরে উপহাস ও উপেক্ষা করিবে না।" এইবার আমাদের এই তরুণ সমাজকে ভাবনা দিয়ে পরিকল্পনা দিয়ে সাজাতে হবে, গড়ে তুলতে হবে আমাদের এক "সামাজিক মহাদেশ! কিন্তু এই যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তার অর্থও তো অধীনতা-কে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করা নয়– তারও অর্থ হল অন্যের অধীনে না-থেকে এবার হাতে নিজের-অধীনে বাঁচা। স্বাধীনতা না বলে যদি বলি 'স্বতন্ত্রতা' তাহলেও একই তর্ক কাজ করবে– তাহলেও বলতে হবে এমন একটা তন্ত্র গড়ার অধিকার আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি বিদেশি বিভাষী শাসক কুলের হাত থেকে– সুদীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেখানে আমাদের হাতে রয়েছে এই সিদ্ধান্ত যে আমরা স্বদেশ চালনার কেমন নিয়মাবলি বা কেমন আইন তৈরি করব, কেমন হবে আমাদের তন্ত্র?

সমস্যা হচ্ছে, পরাধীনতা থেকে 'শাপমোচন' হল ঠিকই কিন্তু এই মোচনের মধ্যেই কিন্তু আরও নতুন নতুন না-জানা 'শাপ' আছে লুকিয়ে। সাধে কি অত দিন আগেই রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছেন–

"স্বাধীনতাই এ সমাজের সর্বপ্রধান শত্রু। যে রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুতেই জীবিত পদার্থের জীবনধারণ হয়, সেই রৌদ্র

বৃষ্টি বায়ুতেই ইহার ইষ্টক জীর্ণ করে, এইজন্য সমাজশিল্পী অদ্ভুত নৈপুণ্য সহকারে এই কারাগারের মধ্যে সমস্ত স্বাধীন স্বাভাবিক শক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়াছে।

যে যেখানে আছে, সে ঠিক সেইখানেই থাকিলে তবে এই জড়সমাজ রক্ষিত হয়। তিলমাত্র নড়িলে-চড়িলে সমস্তটাই সশব্দে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্য যেখানেই জীবন চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তৎক্ষণাৎ চাপ দিতে হয়।" (সমাজ গ্রন্থের 'সমুদ্রযাত্রা' থেকে)।

কত কষ্টে, কত রাগে ও ক্ষোভে যে উনি একথা বলছেন বাধ্য হয়ে তা কি আর বোঝাতে হবে? তাই আফসোস করে লিখছেন : ..."হায়, আমরা সমুদ্র পার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্য জাতিকে সমুদ্র পার হইতে নিষেধ করিতে পারে নাই। ....আমরা যেন ইংল্যাণ্ডে না গেলাম, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। অতি-বড়ো পবিত্র হিন্দুও শৈশব হইতে আপন পুত্রকে ইংরেজি শিখাইতেছে; এমন-কি, মাতৃভাষা শিখাইতেছে না; এবং শিক্ষাসমিতি-সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাশিক্ষার প্রস্তাব উঠিতেছে, তখন স্বদেশের লোকেই তো তাহাতে প্রধান আপত্তি করিতেছে" (উদ্ধৃতি : ঐ)। বঙ্গদেশজ অন্যদের সম্বন্ধে আমরা যদি মনে করি যে যারা সমাজ নামক একটা লম্বা বাড়ির নিচের তলে থাকে (কবির সংজ্ঞায় : 'নিম্নসাধারণ'), তাদের এত বিদ্যা-শিক্ষার দরকার নেই, বরং বেশি পড়াশোনা শিখলে তাদের ক্ষতিই হবে, তারা আর না থাকতে চাইবে গ্রামে, না করবে চাষ-বাস বা বাপ-পিতামহর জীবিকায় নিজেদের যুক্ত– তারাই কিন্তু উনিশ শতকের শেষে এসে শুনছিল যে "বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন কি অনিষ্টকর" (পরিচয় গ্রন্থের 'শিক্ষার বাহন' থেকে)।

প্রশ্ন হচ্ছে এত সব সমস্যার মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমরা 'বিদ্যা-বিস্তার' করব কেমন করে? সবাই যখন উন্মত্তের মতন ইংরেজি-মাধ্যমের দিকে ছুটছেন যেখানে মাতৃভাষার কোনও স্থানই নেই, আছে শুধু 'এ ফর অ্যাপেল' এবং 'জিঙ্গল বেল' বা 'টাম্বল ডাউন ডি'-য়ের সেখানে দেখা যাচ্ছে বিদ্যাবিস্তারের সর্বপ্রধান বাধা হচ্ছে বিদ্যার বাহন যেখানে উচ্চ-শিক্ষার জন্য ইংরেজির স্থান থাকলেও শুরুটা হতেই হবে 'মাতৃ-ভাষা' দিয়ে। কবির এই প্রসঙ্গে উদাহরণ-খানি কবি সুলভই বটে লিখছেন : "বিদেশি মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।" ওঁর বক্তব্য হল মাতৃভাষায় শেষ-মেষ উচ্চতর শিক্ষারও ব্যবস্থা করা দরকার, যেমনটা অন্য অনেক প্রগতিশীল দেশে করা হয়েছে। ওঁর তর্ক হল জাপানি ভাষার ধারণশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়, কেননা নতুন কথা, শব্দ ও পদ-বন্ধ সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। অথচ যা জাপানে সম্ভব হল তা আমরা অসম্ভব বলে ছেড়ে দিয়ে সরাসরি 'শুধু-ইংরেজি' (Only English) মাধ্যমের দিকে ঝুঁকে পড়লাম– এ কেমন বিবেচনা? তাই আশ্চর্যের কিছু নেই যে উনি বলবেন : "আমাদের ভরসা এতই কম যে, ইস্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যেসব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলাভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না। উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বৈ কি, সেইজন্যেই কঠোর সংকল্প চাই।" সবশেষে শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা চিন্তিত তাঁদের উদ্দেশে উনি প্রশ্ন করছেন : "মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্–সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল?"

এই প্রসঙ্গে শেষ করার আগে মনে করিয়ে দিই 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'-এ (আত্মশক্তি), রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাতৃ-ভাষাগুলির বৈচিত্র্য নিয়েও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। ওঁর বক্তব্য হল সে যুগে বিদেশি পণ্ডিতেরা বলতেন "এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে,

কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।" এর কারণ হিসেবে উনি একথা আমাদের পরিষ্কার করে দেখালেন ও বোঝালেন যে আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি– অবশ্যই আমাদেরই দোষে– আমাদেরই যথেষ্ট উৎসাহের অভাবে; তাই এই বিষয়ে সাহিত্য পরিষদের কি কর্তব্য তা খোলসা করে বলতে গিয়ে উনি বলেছেন : "বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।"

নিজেকে না জানা বা না জানতে চাওয়ার আক্ষেপ ওঁর বহু গল্প-উপন্যাসের সংলাপের মধ্যে দিয়েও ফুটে উঠেছে বারংবার। ভাষার বিষয়ে জ্ঞান বা পড়াশোনা শুধু যে পরীক্ষা-পাশের জন্য নয়, যে কোনও শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালিরই যে এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; তাই কবি-ভাষাবিদ লিখছেন : "আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজেদের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষা রহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না ।"

আজও আমাদের কাছে এই হাহাকার আর আক্ষেপের কি কোনো উত্তর আছে?

Adults Are The Key

Finlay M. Macleod

Introduction

My name is Finlay M. Macleod, I am from Scotland and a long time advocate and worker for the revival and maintenance of the Gaelic language and culture and from this stance, may I place before you the following information.

1) In 1872 there were some 230,000 Gaelic speakers in Scotland with another 1,000,000 or so scattered throughout the world.

2) The Education Act of 1872 was enacted without any reference to Gaelic whatsoever.

3) Prior to its enactment there were a number of Gaelic schools, however The Education Act of 1872 systematically went out of its way to kill the language off entirely; various methods were used such as belting children who voiced any Gaelic, the hanging of a Goat's or a Sheep's skull around the neck of any child that used Gaelic. As one would expect Gaelic speaking numbers began and continued to drop and as a result, today there are some 60,000 Gaelic speakers in Scotland.

A central feature of any meaningful minority language revival is its teaching and the calibre and skills of those who carry out the courses etc.

4) Native speakers can only be created in a home where at least one parent has gained a fluency in the minority language before the child is born.

5) Without question, adults are the key factor in the revival of most minority languages, added to which the popular misconception which states that children learn quicker, whereas in actual fact, adults learn a second or even a third language at least 10 times faster than children. This statement of course recognises that this only happens in a conductive environment, with innovative courses, stimulating materials and resources, administered by well trained inspirational tutors.

6) In my experience speed is of the essence in saving an endangered language, be it Gaelic or any other and the fact that adults can breakthrough to speaking a second language remarkably quickly; in fact, months rather than years is quite achievable, this of course presumes that high speed learning and the factors outlined in number four are all in place.

7) New native speakers can be created but it will require us, to begin with parents actually speaking the said language from day one of a child's life, followed by a review of the work so as to achieve a holistic approach.

8) Formal education establishments such as schools, colleges, universities etc. do an excellent job, however, the language learning they deliver is of an academic not a social nature and this is not the area we are discussing on this occasion.

9) It is my absolute belief regarding my own Scottish situation, that any meaningful Gaelic language and cultural revival, will require a wealth of pre-birth language courses that facilitate prospective parents to learn Gaelic before the child is born; what is needed also, are a great number of ongoing Gaelic In The Home, Altram Courses, Gaelic activities groups and a focus on Family Language Action Plans.

   I also believe the information given above, will travel readily and work well with almost any other worldwide minority language.

10) Underpinning the work of language acquisition are the resources and materials etc. which include a wide and stimulating range of manuals, handbooks, road maps, language trackers; all deal with the lifestyle, family, daily language usage, training handbooks viewed from the student, tutor, parent or family perspectives.

11) The various lifestyles that most adults have these days, means that we can with ease teach most languages by way of the endlessly flexible and user-friendly Total Immersion Plus strategies and methodologies (TIP) as created by Moray Language Centre.

12) Another key factor to the success of language revival is the need to draw in whole communities and provide them with specific courses, materials and resources etc.; yet another important objective we must focus on, are those who are highly committed and want to become fluent in a language and as quickly as possible.

13) A central feature of any meaningful minority language revival is its teaching and the calibre and skills of those who carry out the courses etc. I am referring to the tutors, their training, mentoring, a variety of specialised courses, methodologies, strategies and support.

14) We need to engage with native minority language speakers, especially older ones, in order to harness their language expertise and thus reap the benefits of their skills; an excellent strategy for enriching any minority language.

15) Sustainable language acquisition can only be fully accomplished on full time courses; part time courses arguably are less than "fit for purpose", realistically however, no one seriously wants to spend 10, 20 or 30 years learning any language, albeit a second or third.

   We also have in Scotland evening classes and block courses however, they do not work well, in actual fact, they simply do not produce nearly enough fluent speakers and within an acceptable time frame.

16) Moreover, traditional language learning methods are not only slow and ultimately demotivating, but also have an unacceptably high dropout rate that translates into less than 1% of adults reaching any kind of fluency; it is also a tragic waste of time, effort, money and people; the language in question is not served well either.

17) Consideration and development of a second language centred social, cultural, interests, hobbies, are essential; again, an excellent strategy for enriching and adding diversity to any minority language acquisition.

18) We have after many years of research learnt that it requires at least five fluent speakers living in close proximity and using Total Immersion Plus (TIP) strategies and methodologies for any lasting language revival.

19) Within our own Gaelic acquisition field we maintain a strictly "Gaelic Only " environment; absolutely essential if learners are to get to grips with it and at the same time gain a respect for the language and the part it will play in their own lifestyle.

20) During the conversational Gaelic learning phase there is no contact with reading, writing, grammar etc., in fact books are not acceptable in the learning space.

21) Interestingly enough, in Nova Scotia having begun in 2006 there are now in 2015 some 1,200 and rising fluent speakers; the success they now enjoy rests largely on their use of and commitment to Total Immersion Plus strategies and methodologies (TIP).

22) It is a sad fact that only a tiny percentage of children who have been through the Gaelic immersion in primary school and high schools, are then able to pass Gaelic to their children, when they themselves reach adulthood.

It used to be thought that children would be the way to pass Gaelic onto their parents, the undeniable fact is that it is parents who pass the language onto their children, not the other way about.

What Success Looks Like When It Comes To Reviving Minority Languages

1) Adults and children using a minority language on a daily basis, this means all family members conversing with each other in the said language in a casual and natural way in the home, out on social occasions, trips, holidays, visiting etc.

2) Moving on to the community aspect, the principle here is much the same as above, though here things will be on a much larger scale, as well as there being many more language usage opportunities such as shops, work, doctor/dentist, etc.

3) Students learning and becoming fluent in the language at high speed and then being able to pass on the language to others.

4) An ever expanding innovative range of training courses, specialised courses, materials, resources, support agencies; also a growing and readily available portfolio of quality manuals, handbooks, guides etc. Of course there will also be a rising demand for highly skilled personnel able to deliver such a high performance service; job creation is also an attractive feature within this scenario.

5) Children having the minority language as the first language, thus by way of these newly created native fluent speakers, there is a good chance of it being sustained in the face of the majority language.

6) A growing number of educational establishments at every level offering a rich assortment of minority language courses etc, for both learner and fluent speaker.

7) High quality training, advice and support are also fundamental to the quality and performance of Gaelic acquisition and in order to achieve this objective there is a requirement for tutors to be 0n 6 month training courses and for tutor trainers, an additional 6 months training will also be a requirement.

8) A healthy supply of funding sources adequately serving minority language agencies, interests, students etc.

9) If all the above comes into being, thus an "Endangered Minority Language" stops being endangered.

আর্মেনীয় বর্ণমালা

ম্রো ভাষা ও বর্ণমালার ক্রমবিকাশ

সিংইয়ং ম্রো

বান্দরবান জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। এ জেলায় বাংলাসহ দশটি ভাষাভাষী বাস করে। পূর্বে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কাপ্তাই উপজেলার অন্তর্গত ভার্য্যাতলী মৌজায় কিছু ম্রো পরিবার ছিল। ১৯৮৫ সালে তারা বান্দরবানে স্থানান্তরিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ম্রো জনগোষ্ঠী বাংলাদেশ ছাড়াও মায়ানমার আরাকান রাজ্যে বাস করে। বাংলাদেশে ম্রোদেরকে বাঙালি, চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা মুরুং বলে এবং মায়ানমার আরাকানে তারা 'মিয়ো' (Myu) নামে পরিচিত। ২০১১ সালের বাংলাদেশ সরকারের জনশুমারি অনুযায়ী এ দেশে ম্রো জনসংখ্যা হলো ৩৮০২২ জন। ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মতে, ম্রোরা চতুর্দশ শতাব্দীতে আরাকানে সহিংসতা বাধলে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে আসে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন (১৯০৩) জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন (G.A Grierson)। পরবর্তীকালে তাঁর গবেষণা *Linguistic Survey of India* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি পার্বত্য অঞ্চলের ভাষাগুলির শ্রেণিবিভাগ দেখিয়েছেন এভাবে :

ভাষা শাখার নাম	দল		জনগোষ্ঠী
ইন্দো-আর্য	আর্য		চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা
ভোট-বর্মি	বর্মি		মারমা ও রাখাইন
	বোড়ো		ত্রিপুরা, রিয়াং ও উসুই
	সাক-লুই		চাক
	কুকি-চিন	উত্তর কুকি-চিন	লুসাই, পাংখোয়া, বম ও খেয়াং
		দক্ষিণ কুকি-চিন	খুমি
		ম্রো	ম্রো

ভাষাকে লিখিতভাবে প্রকাশের জন্য প্রয়োজন হয় লিখন-ব্যবস্থার। আগে মানুষের জন্ম হয়, তার পর সে ভাষা শেখে। লেখার ব্যবস্থাটি তাই এসেছে অনেক পরে। লিখন-ব্যবস্থা ভাষাকে বিকশিত ও সুরক্ষিত করে। লেখার ব্যবস্থা না থাকলে ভাষার বিপন্ন অবস্থা কাটে না। এককালে ম্রোদের কোনো লিখনবিধি ছিল না। ম্রোদের মহাসাধক মেনলে ম্রো (ক্রামাদি) সেই অভাব পূরণ করেছেন। তিনি তৈরি করেছেন ম্রো বর্ণমালা (১৯৮৫-৮৬)। এতে মোট ৩১টি বর্ণ ও ৯টি সংখ্যা রয়েছে। ম্রো বর্ণমালার সাথে রোমক, থাই, বর্মি ও চীনা বর্ণমালার সাদৃশ্য রয়েছে।

তা	ঙি	য়ু	মি	বা	দা	আ
ফি	খৈ	হাউ	দাই	চু	কৌ	অল
মুম	নিন	পা	ও	অ	রু	সি
থ	অ্	ওয়া	এ	কু	লান	লা
		হাই	রি	তেক		

চিত্র-০১ : ম্রো বর্ণমালা

মেনলে ম্রো নিরুদ্দিষ্ট হলে তাঁর শিষ্যগণ ম্রো ভাষা ও এ ভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৯৮৬ সালে *মোচ চা সাংরা* অর্থাৎ ম্রো ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে আসে এবং এক বছর ধরে ম্রো বর্ণমালা শেখে। তারাই পরবর্তীকালে নিজেদের এলাকায় গিয়ে ম্রো-ভাষাশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন।

প্রথম ব্যাচটি সফলভাবে শিক্ষালাভ করলে ম্রো জাতিসত্তা অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপক সাড়া জাগে। এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ক্রামাদি মেনলে শিষ্যদের মাধ্যমে। এজন্য অর্থ যোগান দিয়েছেন ম্রো জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট পাড়াপ্রতিবেশী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। ক্রামাদি শিষ্যরা ও ৩০ জন প্রশিক্ষিত শিক্ষার্থীর একাগ্রতা ও উদ্দীপনায় এ কার্যক্রমকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কর্মীদল নিজেদের উদ্যোগে ম্রো এলাকায় ম্রো বর্ণমালার শিক্ষাদানে নিয়োজিত হয়। পরবর্তীতে বাৎসরিক ধর্মীয় সম্মেলনে ম্রো ভাষা ও এ ভাষার বর্ণমালার ভবিষ্যৎকর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়।

ম্রো ভাষা ও বর্ণমালার গবেষণা ও প্রকাশনাসহ অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য ১৯৯০ সালের ১৮ জানুয়ারি গঠিত হয় ম্রো ভাষা বর্ণমালা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটি। এগারো সদস্যের এ কমিটির মাধ্যমে ভাষা কমিটির যাত্রা শুরু হয়। কমিটির কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে মূল কমিটির সঙ্গে উপজেলা ভিত্তিক উপকমিটি গঠন করা হয় (১৯৯৩)।

১৯৯৬ সালে ১২ ডিসেম্বর মেনরুম ম্রো তথ্যপ্রযুক্তিতে ম্রো বর্ণমালা ব্যবহারের উপযোগী করে তোলেন। তিনি উদ্ভাবন করেন রিয়েন নামের ম্রো ফন্ট। ম্রো বর্ণমালাকে অধিকতর সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করার জন্য ভাষা কমিটি মনোযোগী হয়ে ওঠেন। কমিটির প্রচেষ্টার ফলে ম্রো বর্ণমালার সাহায্যে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়। এভাবে ২০০৩ সালে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা দানের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয় পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি।

ম্রো-ভাষীদের শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে ৩০ জন দক্ষ শিক্ষার্থী নিয়ে দু-মাস মেয়াদি অ্যাকশন বেইজ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই শিক্ষার্থীদেরকে মাঠ পর্যায়ে তাদের এলাকার ২০০ ম্রো গ্রামে পাঠানো হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি শিক্ষার্থী ৩-৪টি গ্রামকে নিয়ে কেন্দ্র গড়ে তুলবে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে তারা শিক্ষাদান করবেন। গ্রামবাসীরা মুষ্ঠি চালের জমাকৃত অর্থ থেকে মাসিক ১০০০ টাকা সম্মানী ভাতা প্রদান করে থাকে। ১৯৯১-২০১০ সালের মধ্যে এ কার্যক্রম ৯০% সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে ম্রো সমাজে কেবল ম্রো ভাষা শিক্ষা নয় জাতীয় শিক্ষা গ্রহণেও এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। এককালে শিক্ষাবিমুখ ম্রো ছেলে-মেয়েদেরকে বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়া করতে দেখা যাচ্ছে। ম্রোরা এখন নিজ ভাষায় ৬০% সাক্ষরতা অর্জন করেছে।

১৯৯১ সালের ২৯শে এপ্রিল প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে শিক্ষা কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গেলে আর্থিক সংকটের কারণে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ম্রো ভাষা চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ২০০০ সালে বান্দরবান উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (বর্তমানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট) ম্রো আবাসিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ম্রো ভাষাশিক্ষা কোর্স চালু করলে ম্রোদের মাতৃভাষা উন্নয়নে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ম্রো ভাষাশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কেন্দ্র বান্দরবান জেলায় সাতটি উপজেলার মোট ৩৫টি গ্রামে গণপাঠশালায় ম্রো ভাষায় স্কুল পরিচালনা করে। এতে প্রায় ১০০০ ম্রো ছেলে মেয়েরা মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ পায়। এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করে অনেক ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে দেশে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান ম্রো ভাষায় রচিত শিশু শ্রেণি থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত মোট এক হাজার কপি বই মুদ্রণ করে

বিদ্যালয়গুলি পরিচালনা করে। এতে ৪৫ জন ম্রো যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হয়। UNDP-CHTDF-এর অর্থায়নে স্থানীয় উন্নয়ন তৈমু ২০০৮-২০০৯ সালে Multi Lingual Education (MLE) Program-এর মাধ্যমে থানচি উপজেলায় ৫টি গ্রামে ম্রো ভাষা বিদ্যালয় পরিচালনা করে। বর্তমানে থানচি, রুমা ও আলীকদম উপজেলার ২৩টি ম্রো গ্রামে শিক্ষাকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ম্রো ভাষায় বেশ কিছুসংখ্যক পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক সরকারের কারিকুলাম অনুসরণ করে রচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য ম্রোভাষা পারদর্শী ব্যক্তিদের নিয়ে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা শিশু শ্রেণি থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। এছাড়া বাৎসরিক পঞ্জিকা, সাহিত্য সাময়িকীও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। 'রীইয়ুংখীতি' হলো সুনীতি। এ গ্রন্থে ক্রামাধর্মের রীতিনীতির উল্লেখ রয়েছে। *রীপ্রিম ক্রা* গ্রন্থ আগের দিনের ম্রোদের সামাজিক রীতিনীতি, আইন-কানুন, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-ঐতিহ্য, লোককথা, লোককাহিনি ইত্যাদি নিয়ে লেখা। *ফুংপ্রেম মাংলং সাংচিয়া* গ্রন্থটি বর্তমান ম্রোদের জনপ্রিয় নাটকগুলির অন্যতম।

এখন সময় এসেছে ম্রো ভাষার উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণের। ম্রো ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য প্রাথমিক স্তরে নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে। আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি বিধিবদ্ধ হয়ে আছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. পাঠ্যবই প্রণয়ন : ভাষাকে উন্নয়ন করতে হলে প্রথমে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন একান্ত জরুরি। বর্তমানের শিশুশ্রেণি থেতে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলেও ছাপার ব্যবস্থা না থাকায় পূর্বের ছাপানো বইগুলি প্রায় দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। পাঠ্যপুস্তক ছাপানো মানে ম্রো লিপি ও বর্ণমালা গ্রহণ ও এর চর্চা করা। এই পাঠ্যপুস্তকগুলি NCTB-র অনুসরণে প্রণয়ন করা উচিত।

২. শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা : মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য চিম্বুক পাহাড়ে ক্রামাদি পাড়ায় অবস্থিত ম্রো ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবহার করা যাবে। এখানে তিনমাস মেয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন ম্রো ভাষা কমিটির নেতৃবৃন্দ।

৩. কারিগরি ও শিক্ষা-উপকরণ : ক্রামাদি মেনলে লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ করা প্রয়োজন।

উপসংহার

সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বর্তমানে ম্রো ভাষার উন্নয়ন ঘটলেও ভাষাভাষীদের বিশাল অংশ এখনো এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক ম্রো এখনো তাদের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না। শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত বইয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। গ্রন্থ রচনা ও তা মুদ্রণে সকলের সহায়তা প্রদান করলে সেই অভাব দূর করা যায়।

ফটো-গ্যালারি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪

শেখ হাসিনা

শেখ হাসিনা

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪
Martyrs' Day & International Mother Language Day 2014
শেখ হাসিনা

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪
Martyrs' Day & International Mother Language Day 2014
শেখ হাসিনা
সভাপতি: জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪
Martyrs' Day & International Mother Language Day 2014
শেখ হাসিনা

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪
Martyrs' Day & International Mother Language Day 2014
সেমিনার

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪
Martyrs' Day & International Mother Language Day 2014
সেমিনার

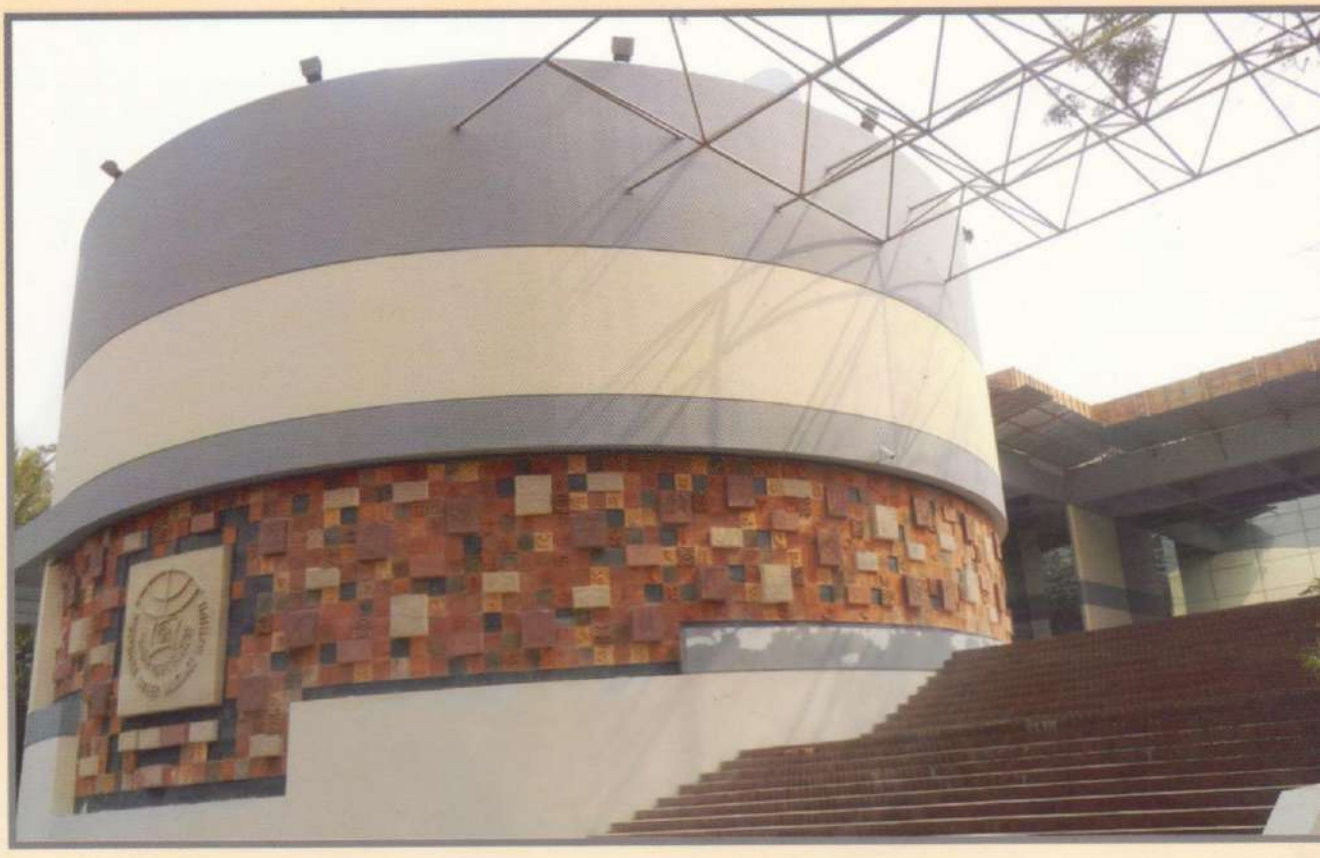

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট